শ্রীমতী তৃপ্তিলতা ও

শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘটকের

করকমলে

হয়ে আধীনতার

যে যৌবন ভা জাগ্রত

ণয়ে চলেছে—তা থা আছে

বই-এ! বর্ত্ত । বীরপূজার গৌর বাংলার নারী-মনের অপরূপ মাহাত্ম্য কোথায় আসন নি—নিপুন লেখকের তুলিকায় তারই চিত্র ফুটে উঠেছে অক হিমায়। ইতিহাসের অনিবার্য্য পরিনীতিই এ বই-এর প্রতি বিষয়—জীবনের ইতিহাস, জাগ্রত যৌবনের ইতিহাস!

বিনী

প্রকা—

কাত্যায়নী ষ্টল

মাটির পুতুল ওরা !

ওরা—ঐ মাতা ধরিত্রীর স্নেহের সন্তানরা সত্যি মাটির পুতুল। ওরা মাটি থেকেই জন্মায়, আবার মাটিতেই মিশে যায় ;—এই জন্ম এবং মৃত্যুর প্রান্তবিন্দু দুটির মাঝখানে যে সময়টুকু, তাকেই ওরা অমরত্ব দিতে চায় মানবত্ব দিয়ে, শৌর্য্যে বীর্য্যে, দয়া-ক্ষমা-ত্যাগের ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য এবং ঈশ্বরানুভূতির অলৌকিকত্বে। কিন্তু ওরা মাটি—এ সত্য ওরা যতই অস্বীকার করুক, ওদের অন্তঃস্বত্বা জানে, ওরা মৃৎপুত্তলি !

ওরা মৃত্তিকা হোলেও ওদের মধ্যে কিন্তু চিন্ময় পুরুষের আবির্ভাব ঘটে কখনো কখনো। আজকার পৃথিবী ওদের বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু আগামী যুগের পৃথিবী ওদের চিনবে। তাই মাতা ধরিত্রী ওদের বুকে ধারণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এই এ্যাটোম ব্যোমের অতি মানবীয় যুগেও। আশা অনন্ত, ধরিত্রীমাতাও সেই আশায় বুক বেঁধে আছেন।

যুদ্ধশ্রান্ত পৃথিবীর পরিস্থিতি যুদ্ধকালের পৃথিবী থেকে কিছু কম অশান্ত নয়, যদিও শান্তি-প্রস্তাব, জগতের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা, সমগ্র পৃথিবীর মানব-সাধারণের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রগত মুক্তি, তার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পরিপূরণের পাকা প্রস্তাব—বাংলার মহামারী, মন্বন্তর, মৃত্যুহার বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের দরবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে মানুষ বেশ শশব্যস্ত, ঠিক সেই সময় প্রেমের গল্প শোনাতে যাওয়া নিদারুণ বোকামী, তবু প্রেমের গল্পই বলতে হোল, যদিও এ প্রেম জীবনকে অতিক্রম করা যৌবনোত্তর প্রেম—মৃত্যুর পথচারী অমর প্রেম! মাটির মানুষের জন্য এ প্রেম কি বস্তু নিয়ে আসে, তাই দেখা যাক্।

অসিপুর গ্রামটায় বহু লোকের বাস,—নানা জাতির সমবায়; গ্রামের দুঃখ-দৈন্য, ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমার সঙ্গে আত্মীয়তা আর আত্মতোষণতা নিয়ে দিন তাদের ভালই কাটছিল এতকাল, হঠাৎ গোল বাধলো সেদিন,—গাঁয়ে একটা মেয়ে-ইস্কুল করতে হবে, এবং তার প্রধানা-অপ্রধানা সব শিক্ষয়িত্রীকে হতে হবে মেয়ে। মতের বিভিন্নতা দেখা দিল,—কারণ ভাল মেয়ে শিক্ষয়িত্রীর জন্য অনেক টাকা মাইনে দরকার; স্কুলের অত টাকা নেই। তারপর যে প্রাচীন পণ্ডিতটি এতকাল গ্রাম্যপাঠশালায় ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে পড়িয়ে এসেছেন, তাঁকে একেবারে বেকার হয়ে যেতে হয়, কারণ ছেলেদের জন্য হাইস্কুল আছে এখানে,—পাঠশালায় ছেলে তাই খুবই কম। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় কারণ হোল,—জুতোজামাপরা চালিয়াত কোনো

কলকাতার মেয়েকে এ গাঁয়ের মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী করতে অনেকের আপত্তি—মেয়েরা নাকি এতে বিবি বনে যাবে।

অনেক তর্কবিতর্ক হোল, কিছুই স্থির হোল না; শেষে মেয়ে ইস্কুল করার প্রস্তাবটাই প্রায় ধামাচাপা পড়ে পড়ে, এমন সময় গ্রামে এসে পৌঁছালো রোহিতাশ্ব—,অরুণ মুখুজ্যের ছোট ছেলে।

ভারতের মুক্তি অন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিল, এই পরশুদিন মাত্র ছাড় পেয়ে কলকাতা ঘুরে গ্রামে এসে পৌঁচেছে, আজই সকালে। গ্রামে তখ হোলির উৎসব—আবির পাওয়া যায় না, তাই ধূলোকাদা ছিটোনো হ'চ্ছে।

ঘরে ঢুকবার আগেই রোহিত ওদের দলে ভিড়ে গেল ধূলো নিয়ে।

"আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমারই সনে—
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে—"

প্রাণকৃষ্ণ মুখো তারস্বরে গান ধরেছেন, নরহরি বৈষ্ণব উদ্দাম লাফ দিয়ে শ্রীখোল বাজাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ স্যাকরা খঞ্জনীতে বোল্ তুলছে, বাঁশের পিচকিরিতে নালার কাদাজল ভরে বাবুদের গাবলু রাস্তার পাশে দাঁড়ানো মেয়েগুলোকে ভিজিয়ে দিচ্ছে—ঠিক সেই সময় রোহিত এসে ধূলো তুলে গান ধরলো প্রাণকৃষ্ণর সঙ্গে :—

"ও লালে লাল হো, মদন গোপাল……"

গাঁয়ের লোক ওকে পেয়ে আনন্দিত হোল খুবই; বহুদিন পরে রোহিত ফিরে এসেছে, প্রায় চার বছর; গিয়েছিল বি, এ, পরীক্ষা দেবার আগে; এর মধ্যে বি, এ, এবং এম-এ পাশও

নাকি করে ফেলেছে ; তাছাড়া এমন কতকগুলো কাজ শিখেছে যা নাকি সাধারণ ভাবে শেখা খুবই শক্ত ! রাজ-সরকারের আতিথ্য রোহিতের উপকারই করেছে বলতে হবে। সমবয়সী ছেলেরা ওকে মাঝে নিয়ে উৎসব করলো হোলীর, একজন লাল করবীর একটা মালা গেঁথে পরিয়ে দিল ওর গলায় ;—হোলির উৎসবের সঙ্গে রোহিতের অভিনন্দনটাও হয়ে গেল—গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সকলেই দেখলো, আর দেখলো রুক্মিণী।

রুক্মিণী এ গাঁয়ের মেয়ে নয়—ওর বোনের শ্বশুরবাড়ী এই গাঁয়ে ; দোলের উৎসবে বোনের বাড়ী বেড়াতে এসেছে ; দোল দেখেই কলকাতা ফিরবে ; ওর বোন সত্যভামা বাবুদের বাড়ীর বৌ,—ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ছোটবোনকে সঙ্গে নিয়ে হোলির আবির-খেলা দেখছিল ; বললো,—ঐ যে খুব ফরসাপানা,—ঐ রোহিতাশ্ব ; আমি ওকে বিয়ের সময় একবার মাত্র দেখেছিলাম ; সেই বছরই জেলে যায়—আজই ফিরলো শুনছি।

—হুঁ—রুক্মিণী আর কোনো কথা না বলে চেয়েই রইল।

সংকীর্ত্তনের সঙ্গে হোলির ধূলোখেলা ধীরে ধীরে চলে গেল গ্রামপ্রদক্ষিণের পথে ; উদ্দাম নৃত্য আর উচ্চ কীর্ত্তন গান করতে করতে ওরা যাচ্ছে, কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে রোহিতের দীর্ঘ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিটাই সকলের নজরে পড়ে—রুক্মিণী চেয়েই রইল—হোলির দল দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তবু রুক্মিণী চেয়েই আছে।

—চল—নীচে যাই ! সত্যভামা বললো।

—হুঁ—। বলে নীচে নেমে এল রুক্মিণী বোনের হাত ধরে, কিন্তু রুক্মিণী তখন তার দেহে ছিল কি না কে জানে। সত্যভামা

অত খোঁজ করলো না। বাড়ীতে বিস্তর কাজ—সে নিজের কাজে চলে গেল। রুক্মিণী বসে রইলো সংকীর্ত্তনের দলটা আবার কখন ফিরবে তার অপেক্ষায়। ঐ যে রোহিত—ওকেই দরকার রুক্মিণীর। কেন দরকার সেই কথাটাই বলতে হবে—প্রেমে পড়ার জন্য নয়, প্রেমের উপরের কোন কিছুর জন্য।

অত যুক্তাক্ষর যুক্ত নামটা উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয়, তাই দাদারা বলে রুক্‌ণী! ঐ নামটাই চলিত হয়ে গেছে। কেউ কেউ রুকুণ-ও বলে। সে বছর রুক্‌ণী ম্যাট্রিক দেবে,—ছোটদা একদিন একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এলো ওদের বাড়ীতে। ভারী সুন্দর ছেলেটা, ছোটদাদার বন্ধু! দুদিন ছিল সে রুকণীদের ঘরে—ঘরে মানে ঘরের ভেতর, একেবারে অন্তঃপুরে। সরকার নাকি ওর নামে হুলিয়া জারি করেছিল, তাই ও ফেরার হয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল রুকণীদের ওখানে। সেই দুটো দিন ওকে কি-রকম কষ্টে যে লুকিয়ে রেখেছিল রুকণী, তার ছোটদা আর রুকণীর মা, তা বলবার নয়। কিন্তু রুকণীর বাবা আপত্তি করলেন; একজন ফেরারী আসামীকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলেন; তাঁর সঙ্গে বড়দাও যোগ দিয়ে বললেন যে অকারণ কে বিপদ ঘাড়ে নিতে যায়; অতএব নিরুপায় হয়ে দ্বিতীয় রাত্রের শেষ দিকে তাকে বিদায় করে দিতে হয়েছিল—সেই বিদায় মুহূর্ত্তটাই ভাবছিল রুক্মিণী। ভাবছিল,—ওর বড় বড় চোখদুটোতে নির্ভয়-জ্যোতির্ম্ময়তা, দৃঢ় ওষ্ঠে আগামী দিনের আশ্বাস, আর কণ্ঠে বজ্রগম্ভীর বাণী—'বন্দে মাতরম্—!'

সত্যভামার সেই বছরই বিয়ে হয়েছে, এবং সে তখন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, তাই ওকে দেখেনি। দেখলে নিশ্চয় আজ চিনতে পারতো; কারণ রুকণী নিঃসংশয় চিনেছে, ঐ ফর্শামত ছেলেটাই সে! কয়েক বছর আগে রাত্রিশেষের অন্ধকারে যাকে রুক্মিণী বিদায় দিয়েছিল খিড়কী পথে,—যাবার সময় হাতে দিয়েছিল রাস্তায় খাবার জন্য দুখানি শুকনো রুটি আর একটু গুড় আর নিজের বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙ্‌লের ছোট্ট আংটিটি,—ও যে সেই—, এতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এত দীর্ঘকাল পরে ওর সঙ্গে দেখা হোল রুক্মিণার? কি এর দরকার ছিল? রুক্মিণী ওর কথা একবারে ভুলে গিয়েছিল, এমন কি, সেই কড়ে আঙ্‌লের আংটির কথাও ভুলে গিয়েছিল রুক্মিণী। আজ কেন অকস্মাৎ ও এল?

এল।—ও এলো নিজের ঘরে; ওর পৈত্রিক ভিটেতে; কিন্তু রুক্মিণী কেন এখানে? তার তো এটা পৈত্রিক ভিটা নয়, শ্বশুরের ভিটাও নয়—তবু রুক্মিণী এখানে রইল আর ঐ লোকটার সঙ্গে দেখাও হোল—হয়তো কথাও হবে। কিন্তু কেন? বিধাতার এ কোন্ চক্রান্ত?

রুক্মিণী এত কথা ঠিক এমনি ভাবেই ভাবছিল না, এলোমেলো ভাবে ভাবছিল! ভাবছিল, ওর সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে। শুধুতে হবে, কড়ে আঙ্‌লের সেই আংটীটা সে বেচেছে কি রেখেছে কোথাও! রুক্মিণীর হাতের দুদিনের সেবা তার মনে আছে কি না—আরো অনেক কথা শুধুবে রুক্মিণী! কিন্তু দেখা হবে তো?

সন্ধ্যেবেলা যাত্রা হবে বাবুদের দোল-তলায়। প্রকাণ্ড আসর সাজানো হয়েছে। ধারে পাশের আট-দশখানা গ্রাম থেকে মেয়ে পুরুষ শুনতে আসছে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে যায়গাটা। বাবুদের অতগুলো ছেলে ভলেন্টিয়ার, তাছাড়া গ্রামের অনেক ছেলে গোলমাল থামাতে পারছে না—যায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি, আসরে ঢুকবার জন্য হুড়াহুড়ি—মেলার মত বিশ্রী ব্যাপার। রুক্মিণী দোতালার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল নীচের অবস্থাটা। পাড়াগাঁয়ে কলকাতার যাত্রা হবে—মানুষগুলোর উৎসাহের অন্ত নেই। বেশ লাগছিল রুক্মিণীর। ইচ্ছে করছিল, সেও নেমে গিয়ে দেখে ; কিন্তু তার যাবার দরকার হবে না। ইচ্ছে করলে সে তার শোবার খাট থেকেই শুনতে পারে যাত্রা,—তাছাড়া মেয়েদের জন্য আসরের একটা দিক চিক দিয়ে আড়াল করে যায়গা করে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও গিয়ে বসতে পারে। কোথায় গিয়ে বসবে, সেটা নির্ভর করছে ওর দিদি সত্যভামার উপর।

কিন্তু যাত্রা আরম্ভ হবার এখনো দেরী আছে ; এখনো সঙ্গত আরম্ভ হয়নি, লোক বসানো চলছে মাত্র। রুক্মিণী এর পর কিছু খাবে, খেয়ে দিদির সঙ্গে যাত্রা শুনতে বসবে গিয়ে। দিদি এখনো গৃহকাজে ব্যস্ত, ভয়ঙ্কর রকম ব্যস্ত। এত বড় সংসারের ভার একা দিদির উপর। রুক্মিণী দু'দশ দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে—কোন কাজই ওকে করতে হয় না। দিদির বর—অর্থাৎ জামাইবাবু জমিদার মানুষ,—চব্বিশ ঘণ্টা নিজের আদায়পত্র, হিসাব-নিকাশ নিয়ে থাকেন—মামলার কথাই

আলোচনা করেন। দিদির ছেলেটা মাত্র সাড়ে তিন বছরের; সেই যা রুক্মিণীর একটু সঙ্গী। কিন্তু সেও এখন চাকরের কোলে চড়ে কোথায় বেরিয়েছে দোল দেখতে। রুক্মিণী একদম একলা।

যাত্রার সঙ্গত আরম্ভ হোল; বাজনা তো নয়, যেন উচ্চ স্বরে চীৎকার; তার সঙ্গে মানুষের গোলমাল; উঃ! ঘরে যেন আগুন লেগেছে একেবারে! রুক্মিণী বিরক্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু বাইরে তাকিয়েই দেখতে পেল—মাথায় খদ্দরের টুপি পরা রোহিতাশ্ব—আসরের প্রধান দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছে, —গোল হচ্ছে; চুপ করুন—আপন আপন যায়গায় বসে পড়ুন।

রুক্মিণী ভেবেছিল, এর পর রোহিত নিশ্চয় একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবে দেশের পরাধীনতা সম্বন্ধে; কিন্তু সে সব কিছুই করলো না,—গোলমাল থামিয়ে সেও বসে পড়লো যাত্রার আসরের পূর্ব্বদিকে। নিরাশ হয়ে গেল রুক্মিণী। অত বড় একজন দেশকর্ম্মী শুধু গোলমাল থামাতেই এসেছে তাহলে? সকালে তো ধূলো নিয়ে খানিকটা বাজে বেয়াড়া ধুলো খেলা খেললো—একদম ভাল দেখাচ্ছিল না রুক্মিণীর চোখে। আবার এবেলা যদি বা এলো তো শুধু গোল থামিয়ে যাত্রা শুনতে বসে গেল! দূর ছাই! এতো ছোট কাজ করতে ও আসে কেন? ওর কি এই সব তুচ্ছ কাজ করা সাজে?

রুক্মিণী আরো অনেকক্ষণ ভাবতো, কিন্তু সত্যভামা খেতে ডাকলো। রুক্মিণী আর একবার রোহিতের উপবিষ্ট মূর্ত্তিটা

দেখে খেতে গেল দিদির সঙ্গে; কিন্তু ওর মনটা যেন বড্ড নিরাশ হয়ে পড়েছে।

প্রণবেন্দ্র চাটুজ্যের মেয়ে রাকা; যেমন দীঘল গড়ন, তেমনি এক পিঠ চুল; টানা টানা চোখ দুটোতে কাজল পরলে ঠিক নীল পদ্মের মত দেখায়। ঠোঁটের গড়নটা এমন হাসি-হাসি যে কাঁদলেও ওকে কুৎসিৎ দেখায় না। ওর চেহারার কিন্তু যে-প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত নিটোল ক্রম-সূক্ষ্মতা—দেখতে এমনি সুন্দর যে, যে-কোনো চক্ষুষ্মানকে মুগ্ধ করে;—ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো যাত্রার আসরের দিকে, যেদিকটায় মেয়েদের জন্য চিক ফেলা আছে।

এমন সকুণ্ঠিত সাবলীল ভঙ্গী কদাচিৎ দেখা যায়। কুণ্ঠার কারণ ওর আছে। ওর বাবা এখনো ওর বিয়ে দিতে পারেন নি, অথচ ও এই ফাল্গুনেই উনিশে পোড়লো। গ্রামের সমবয়সী সবারই বিয়ে হয়ে গেছে—কারু কারু ছেলেও; ওর কিন্তু এখনো বিয়ের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত হোল না—অথচ যৌবন ওর দেহের কানায় কানায় ভর্ত্তি। এই সরম-রাগ ওকে কুন্ঠিত করে রাখে, কিন্তু ও সাবলীল। ওর গতির ছন্দ সত্যেন দত্তের কবিতার মত। ও এগিয়ে আসছে, আসরের কোনো একটা কোনে চুপ করে বসে পড়বে। যাত্রা শুনতে ওর বড় ভালো লাগে, ছোটবেলা থেকে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ-উপপুরাণ পড়ে পড়ে মেয়েটা পুরাণের পাত্র-পাত্রীদের জীবন্ত মনে করে—দেব-ঋষিদের সত্য মনে করে। এমন কি ব্রহ্মশাপ-নরক এবং স্বর্গকেও সত্য মনে

করে। ওর মনের জগতে রাম-লক্ষণ, ভীম-যুধিষ্ঠির এখনো জীবন্ত মানুষ।

চিকঢাকা যায়গাটা আধো অন্ধকার। মূল আসরের সামান্য আলো ঠিকরে পড়েছে চিক্ ভেদ করে, তাই যা একটু আলো আসছে। দলে দলে মেয়েরা ওখানে বসে আছে—বিস্তর মেয়ে। অসিপুর গ্রামটা তো বড় বটেই, তাছাড়া, খড়িকাবাদি খাড়াশোল, রূপশীপুর ইত্যাদি গ্রামের মেয়েরাও ওখানে এসে বসেছে যাত্রা শুন্‌তে। কাজেই তিন-চারশো মেয়ে ওখানে। অবশ্য প্রত্যেক গ্রামের মেয়েরা আলাদা দল করে বসেছে। অসিপুরের মেয়েরা নিয়েছে সামনের ভাল যায়গাটুকু। তার ভালতরটুকু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈদ্যদের মেয়েতে ভর্ত্তি এবং ভালতমটুকু অধিকার করেছে এখানকার জমিদার বাড়ীর মেয়েগুলি। যায়গা প্রায় নাই আর।

কিন্তু রাকা এগিয়ে আসছে। ও জানে, যায়গা পাওয়া কঠিন হবে। যাত্রা তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। বক্তৃতা চলছে নারদের। দেবলোক থেকে তিনি মর্ত্ত্যধামে আসবেন কে বেশি পুণ্যবান তাই দেখবার জন্য—রাকা দাঁড়িয়েই শুন্‌তে লাগলো।

—আয় রে, ও রাকা।—ডাক দিল কমলা।

কমলা ওপাড়ার কায়েতদের মেয়ে, রাকার খেলার সাথী। ওর বিয়ে হয়েছে অনেক দিন; ছেলে হবে তাই বাপের বাড়ী এসেছে দিন কয়েক হোল। ও ডাকছে; ওর কাছে বসবার যায়গাও আছে। কিন্তু রাকার যেতে ইচ্ছে নেই। ওর কাছে

গেলে যাত্রা আর শোনা হবে না, ওর শ্বশুরবাড়ীর গল্পই শুনতে হবে। ওর বর কিরকম কায়দা করে লুকিয়ে ওর জন্যে ডালমুট নিয়ে আসে—রাত দুপুরে জ্যোৎস্নার আলোকে ওকে নিয়ে খিড়কীর ঘাট দিয়ে বেড়াতে যায়—এসব তবু শুনতে ভাল লাগে ; কিন্তু কমলা বলবে, ওর শ্বশুর কত টাকা মাইনে পায়, আর কত লোকের ওপর জুলুম খাটায় ; শাশুড়ী কত ভরি সোনার গহনা পরে, আর ওর শ্বশুরবাড়ীতে কটা বেরাল মাছের কাঁটা খেয়ে মোটা হয়ে গেল।

কিন্তু যায়গা একতিল ও নেই কোথাও। দাঁড়িয়ে যাত্রা শোনা সম্ভব নয়, তাই কমলার দ্বিতীয় ডাকে রাকা এগুলো। —কে ঐ মেয়েটি দিদি ? ঐ যে যাচ্ছে ?

রুক্মিণী প্রশ্ন করলো ওর দিদিকে। আধো অন্ধকার যায়গাটায় ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না রাকাকে। তবু রুক্মিণী ওর পানে চেয়ে ছিল প্রায় মিনিটখানেক ধরে। ওদের বসবার যায়গা আলাদা, সেখানে ফাঁকও আছে কিছু। রুক্মিণী ভাবলো, দিদি নিশ্চয় ওকে এখানেই ডাকবে। কিন্তু দিদি তখন নারদের বক্তৃতা শুনছে। গোলক বিহারী হরির মস্ত লম্বা ময়ুর-পাখাওয়ালা চুড়াটা কাঁপছে একটু একটু, তার সঙ্গে নারদের শনের দাড়ীও—সেইটাই দেখছিল সত্যভামা, অন্যমনস্ক ভাবে বললো,

—কে রে ? কোন্ মেয়েটা।

—ঐ যে, ঐ বসলো গিয়ে ?

রাকা ততক্ষণ কমলার কাছে গিয়ে বসে পড়েছে। এত

লোকের মধ্যে সত্যভামার তাকে নজরে পড়বার কথা নয়, বলল—
—কে জানে কে! সাতখানা গাঁয়ের মেয়ে এসেছে। কে কাকে চেনে!

কিন্তু ঐ মেয়েটি সাতখানা গাঁয়ের নয়, এই গাঁয়েরই। এই সত্য কে জানে কেমন করে রুক্মিণীর মনে যেন জাগ্রত হয়ে উঠছে। সত্যভামা পরম নিবিষ্ট হয়ে দেখছে নারদকে। রুক্মিণী কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে রাকার উপবিষ্ট মূর্ত্তিটাই দেখতে লাগলো। নাঃ—অত সুন্দর কি মানুষ হয়! হয়তো আলো-অন্ধকারে রুক্মিণীর মনে হচ্ছে ওকে অত বেশী সুন্দর।—যেন উর্ব্বশী কিন্তু গায়ের রংটা তেমন ফর্সা নয়; রুক্মিণী ওর চেয়ে ফর্সা, আর রুক্মিণীর চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে, তা যাই বলো বাপু। ওই মেয়েটা তো নিতান্ত গরীব—হাতে দুগাছা কাচের চুড়ি আর কানে—সস্তা বেনারশী হলকরা কানপাশা! ফুঃ!

কিন্তু রুক্মিণী মনে মনে এত সব আলোচনা করেও ঐ মেয়েটাকেই দেখতে লাগলো। আলো-আঁধারীতে ওর রূপটা হয়তো রুক্মিণীর চোখে এতো বেশি সুন্দর ঠেকেছে; নিশ্চয় ও এতো বেশি সুন্দর নয়—আর হলেও রুক্মিণীর কিছুই এসে যেত না—কিন্তু রুক্মিণী দেখেছে, ওই মেয়েটার পরণে মোটা খদ্দরের শাড়ী; লাল পাড়; জমিটা গৈরিক। কাঁধে একটা গোল মত ব্রোচ দিয়ে আঁচলখানা আটকানো। খুব সস্তা ব্রোচ নিশ্চয়, দু আনা দামের ব্রোচ একটা; কিন্তু হতে তো পারে, ঐ ব্রোচটা অমূল্য! ঐ ব্রোচে আছে ভারতের মুক্তিসাধক বীরশ্রেষ্ঠ

সুভাষের মূর্ত্তি খোদিত। কিম্বা স্বয়ং মাতা ভারতের মূর্ত্তিই উৎকীর্ণ আছে, অথবা জাতীয় পতাকা শোভিত আছে! তাহলে তো ঐ দু আনা দামের ব্রোচটা তুষারকীরিট হিমাচলের মতই ভারী হয়ে উঠলো। সোনা মানিক দিয়ে ওকে আর ওজন করা যাবে না—কিন্তু ওটা সত্যই কি অমূল্য ব্রোচ্ ?

হ্যাঁ—রুক্মিণী নিঃশংশয় হয়েছে না দেখেই। কারণটা ও এতক্ষণ মনের কাছেও গোপন রেখেছিল, এবার সেটা চোখের উপর ভেসে উঠলো। ওর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এতখানা চিন্তিত হবার কারণও সেইটাই—রুক্মিণী আসরের প্রধান গেটের দিকে চাইল। রোহিতাশ্ব সেখানে নেই। কিন্তু ঐযে ঐ খদ্দরের টুপি মাথায়, হাতে সরু একটা বেত, ঐতো গোলমাল থামিয়ে বেড়াচ্ছে 'চুপ, করুন, চুপ চুপ'—বলে! বসে পড়ছে না কেও! রুক্মিণী নিজের মনের মধ্যে বিরক্ত হচ্ছে নানা কারণে, তার প্রথমটা ওকে শুত ছোট কাজ করা দেখতে চায় না রুক্মিণী, কিন্তু প্রধান কারণটা হচ্ছে ঐ মেয়েটা যখন আসছিল তখন রোহিতই দিল রাস্তা করে ওকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে; কি যেন একটা দুটো কথাও হোল রোহিতের সঙ্গে ওর। ওর চেহারাটার উপর রুক্মিণীর এমন তীক্ষ্ণ লক্ষ্য হবার ঐটাই তাহলে মূল কারণ! আসরে রোহিত বসে থাকলে তো ওর সঙ্গে তার দেখা হোত না!

কিন্তু কেন রুক্মিণী এসবই ভাবছে? রোহিতের সঙ্গে তার এখনো কোনো কথা হয় নি এখানে। অথচ ওর মনে হচ্ছে, রোহিতের সঙ্গে কথা কইবার অধিকার তার আছে এবং একমাত্র তারই আছে এখানে। ও মেয়েটা কে?

ঈর্ষা ! শিক্ষিতা রুক্মিণী নিজেকে প্রশ্ন করলো এবং অচিরে নিজেকে সম্বৃত করলো ; কিন্তু মনের অজ্ঞাতসারে ওর চোখ বারম্বার ফিরে যাচ্ছে ঐ মেয়েটারই পানে। যাত্রার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত রুক্মিণী বসে আছে ওখানে, কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কি পালা গান হচ্ছে, রুক্মিণী নিশ্চয় বলতে পারবে না।

সত্যভামা বরাবর নিবিষ্ট যাত্রাতে। ওর বড্ড ভাল লাগে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেটা হঠাৎ এসে বললো—মা ঘুম লাগছে !

—আঃ ! বড্ড বিরক্ত হোল সত্যভামা। ওদিকে হরিভক্ত মহারাজ তখন হরিবাসর করবার জন্য ব্যস্ত, যাত্রা ভীষন রকম জমে উঠেছে। কিন্তু ছেলেকে ধমকানো বিপদজনক এখানে। সত্যভামার শাশুড়ী ঠাকুরুণও যাত্রা শুনছেন। ওঁর একমাত্র বংশদুলাল সত্যভামার ঐ ছেলেটা, তাকে ঘুম পাওয়ার জন্য বকুনি দিলে সত্যভামার পিঠে জুতা পড়াও বিচিত্র নয়। তাই 'জ্বালালে বাপু' বলে নিঃশব্দে ওকে কোলে নিলো সত্যভামা। ছেলেটা কদাচিৎ মার কাছে ঘুমোয় ; ঠাকুরমাই তার শোবার আশ্রয় ; কিন্তু আজ ঠাকুরমা যেন কেমন কেমন ; খালি কাঁদছে আর বলছে—হরিবোল, হরি হরি ! হরিবোল !

ছোটছেলেটা ভয় না পেলেও ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। তাই ঠাকুরমাকে ছেড়ে মার কাছে এসে পড়েছে। রুক্মিণী দিদির অবস্থা বুঝে বললো—আয় খোকা, আমার কোলে আয় !

ওকে ছেড়ে দিয়ে বেঁচে গেল সত্যভামা। মাসীর কোলে ঢুকে খোকা, অর্থাৎ চিন্তামনি, ডাক নাম চিনাংশুক এবং 'চিনে' ঘুমিয়ে গেল পাঁচ মিনিটেই।

রাত প্রায় দুটো, রুক্মিণী হাতঘড়ি দেখলো। ঐ মেয়েটা তেমনি বসে আছে, যাত্রা শুনছে, আর রোহিত তেমনি পাহারা দিচ্ছে, গোলমাল থামাচ্ছে; মাঝে মাঝে এদিক পানেও আসছে, কিন্তু কাছাকাছি নয়। মেয়েদের যার যা প্রয়োজন, ছোটছোট ছেলে-ভলেনটিয়াররা তাই মিটিয়ে যাচ্ছে এখানে এসে, রোহিত তাদেরই পরিচালন করছে। এ কাজটা ওকে মানাচ্ছিল ভালই। রুক্মিণীর মনে হচ্ছিল, রোহিত যেন ঐ ছেলে-ভলেনন্টিয়ারদের সেনাপতি; এতক্ষণে রোহিতের কাজের উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জাগ্রত হলো ওর।

একটা ছেলে ভলেন্টিয়ার এই দিকে আসছে। রুক্মিণী তাকে ডেকে চার পয়সার পান আনতে দিল। পান ও খায় না; ওর দিদির ডিবেতে ডজন দুই পান এবং ছটাক দুই দোক্তা আছে; তবু রুক্মিণী পান আনতে দিচ্ছে দোকান থেকে। সত্যভামা ঐ দেখতে পেয়ে বললো—এইতো পান রয়েছে, খা'!

—না! পান তো খাইনা আমি! দোকানের সাজা পান কেমন লাগে দেখবো—মিঠে পান এনো!—ছেলেটাকে বললো।

সত্যভামা আর কিছু বললো না, যাত্রায় তখন একটা মারাত্মক দৃশ্য চলছে, অর্থাৎ রাজপুত্রকে বলি দেওয়া হচ্ছে অতিথির সামনে! ভোলানন্টিয়ার ছেলেটি কলাপাতার ঠোঙ্গাটা রুক্মিণীর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো,—পান নিন!

—ঐ যে পান দিয়ে এলে, ও মেয়েটি কে? রুক্মিণী প্রশ্ন করলো ছেলেটিকে!

—ও কমলাদি, ও পাড়ার কায়েতদের মেয়ে।

—আর ওর পাশে ঐ খদ্দরের শাড়ী?

—ও! ও রাকাদি!

—ওর বাড়ী কোথায়?

—ঐ তো বাড়ী—ঐ যে! ছেলেটি পূর্ব্বদিকে আঙুল বাড়িয়ে নির্দ্দেশ করলে বাড়ীটা। বাড়ী অবশ্য দেখতে পেল না রুক্মিণী কিন্তু এই গ্রামেই ওর বাড়ী তাহ'লে এবং খুব কাছেই। কালই রুক্মিণী ওর খবর নেবে। ওর নাম 'রাকা'! 'র' অক্ষরটার মিল আছে রুক্মিণীর সঙ্গে। রোহিতেরও নামের আত্তক্ষর 'র'। নামের রাজযোটক হয়, জ্যোতিষগ্রন্থে পড়েছে রুক্মিণী। কিন্তু কার সঙ্গে ওর রাজযোটক হবে? রোহিতের সঙ্গে না রাকার সঙ্গে!—যাত্রা ভাল লাগছে না রুক্মিণীর।

ঘরখানা এককালে ভালই ছিল, কিন্তু সে দু' শ' বছর আগের কথা। এখন সে বাড়ী ইংরাজের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার আইনে পড়তে পারে। হ্যাঁ, স্মৃতিচিহ্ন আছেও সে বাড়ীতে অনেক। প্রকাণ্ড দুর্গাদালানের ভাঙ্গা থামগুলো, মর্ম্মর বেদীর কারুকার্য্য, দেওয়ালের চূনবালির মূর্ত্তি, কার্ণিশের বিচিত্র আলিম্পন এবং মেঝের সুদৃশ্য পদ্মলতা এখনো শিল্পরসিকের নয়নানন্দকর। তার পাশেই পাথরের প্রকাণ্ড শিব মন্দির—শিবলিঙ্গ নাই, শুকনো পাতা ভরা থাকে বর্ষাকালে জ্বালানির জন্য। কিন্তু মন্দিরের নিখুঁৎ কারুকার্য্য দেখবার মত। ওরই সামনে বিস্তৃত নাট্যশালা ছিল; তার ভাঙ্গা ছাদটুকু পড়োপড়ো

হয়ে এখনো টিকে আছে। ঐ ছাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখলে ইলোরা অজান্তার রূপশিল্পীর কথা মনে পড়ে।

কিন্তু এ সব পুরানো হয়ে ইতিহাসের আয়ত্তে এসে গেছে। এখনো যেটুকু মানুষের আয়ত্তে আছে তা হচ্ছে মস্ত চৌকোনা উঠানের একদিকে শ্যাওলাধরা একটি বিষ্ণু-মন্দির, আর তার পূর্ব্বে দোতলা একটা কোঠা। ভাঙতে ভাঙতে ঐ কোঠা এখনো রয়ে গেছে; আর উঠানের ঈশান কোনে অতল গভীর পাতকূয়ো, সেটাও ভাঙতে ভাঙতে এখনো এই বাড়ীর লোকদের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। কূয়োর কাছেই তুলসীমঞ্চ, তার পাশে একটা অশোক গাছ।

বিষ্ণু মন্দিরের ভিতরও ঐতিহাসিক সম্পদ আছে, শ্রীবিষ্ণুর কাঠের সিংহাসন। তার কারুকার্য্য যেকোন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে—প্রশস্ত সিংহাসন, তার উপর পেতলের ছোট্ট সিংহাসন, তার উপর পুরোণোদিনের পট্টবস্ত্র এবং নামবস্তে জড়িয়ে আছেন শ্রীবিষ্ণুর গোলাকার শিলাটি।

হাত পা কিছু নাই; নিরাকারত্ব-নির্ব্বিকারত্বের এমন চমৎকার পরিকল্পনা হিন্দু ছাড়া আর কেউ করতে পারেনি। ওর নিরাকারত্বের আওতায় এই পরিবারের সব গরিমাই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে, শুধু আছে একটা আশ্চর্য্য দৃপ্ত আদর্শনিষ্ঠা। সে নিষ্ঠা এই পরিবারের বর্ত্তমান অধিপতি প্রণব চাটুজ্যের মূর্ত্তিতে সুস্পষ্ট।

সুগৌর, সুদীর্ঘকায় প্রৌঢ়! গোঁফ দাড়ী পরিষ্কার করে কামানো, মাথার চুল কুঞ্চিত, গলায় সুশুভ্র উপবীত, পরণে সেই প্রাচীন দিনের ক্ষৌমবস্ত্র আর নামাবলী, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা;

দেখলে মাথা নোয়াবে না, এমন মানুষ আজো জন্মেছে বলে জানা নেই।

দারিদ্র্য অপেক্ষা পাপ নেই। পৃথিবীর সর্ব্ব নিকৃষ্ট পাপ এই দারিদ্র্য, কিন্তু সেই মহা মহা পাপ ওঁর ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে নি! অন্নহীন, বস্ত্রহীন হতদরিদ্র সংসার—অনূঢ়া কন্যা অষ্টাদশ পার হয়ে উনবিংশতিতে পড়লো, জ্যেষ্ঠ পুত্র দীর্ঘকাল কারা-প্রাচীরে অন্তরালে অন্তর্দ্ধান করেছে—তথাপি ঐ আশ্চর্য্য ব্রাহ্মণ হিমাচলের মত অবিচল। মানুষের অন্তরলোকে কোন্ মহান আদর্শ-সূর্য্যের জ্যোতি জ্বললে তবে সে অতখানি দৃঢ় হয়ে খাড়া থাকতে পারে, আধুনিক মানুষের তা বুঝতে সময় লাগবে; প্রণব চাটুজ্যের আদর্শনিষ্ঠা অতীতযুগের ঋষির কথা স্মরণ করায়।

লোকটা অগাধ পণ্ডিত। ঐ বিষ্ণু মন্দিরের একদিকে হাজার খানেক হাতেলেখা পুঁথি আছে, কাঠের মলাটের মধ্যে তারা বিরাট ...রি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডারকে আত্মসাৎ করে রেখেছে, আর ...দেরকে আত্মসাৎ করেছেন ঐ প্রণব চাটুজ্যে। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, স্মৃতি, মীমাংসা, কাব্য, ব্যাকরণ প্রণব চাটুজ্যের প্রাণবায়ুতে গাঁথা আছে যেন। কিন্তু ওঁর কণ্ঠে তার ধ্বনি কদাচিৎ শোনা যায়। ওঁর পাণ্ডিত্যের জ্যোতি ওঁর ললাটে আর লোচনে আর সারা অঙ্গে। দেখলেই মনে হবে, একটা মানুষের মত মানুষ দেখলাম। কিন্তু মহাসিন্ধুর মতই উনি স্নিগ্ধগম্ভীর! শাস্ত্র বাক্য তো দূরের কথা, কদাচিৎ ওঁর মুখ থেকে সংস্কৃত ভাষা বের হয়। বিদ্যা যে কতখানি বিনয় দান করে, ওঁর কাছে না বসলে তা বোঝা যায় না।

কিন্তু জিজ্ঞাসুর কাছে উনি সর্ব্বদা মুক্ত ; সরল বালকের মত উদার। যে কোনো দুরূহ প্রশ্ন নিয়ে যান—আপনাকে মহাসম্মানে বসিয়ে উনি তার সমাধান করে দেবেন এবং এমন ভাবে সমাধান করে দেবেন যে আপনার আর কোনো সংশয় থাকবে না। তাই বহু বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ওঁর কাছে প্রায় প্রত্যহ এসে থাকেন। ওঁর দরিদ্রের সংসার তাঁদের আতিথ্যে কোনদিন কৃপণতা করে নি। এই স্বার্থান্ধ কলিযুগের ইংরাজ আমলে এমন একজন লোক আছে, এ নিশ্চয় অবিশ্বাস্য। কিন্তু সত্যি আছেন প্রণব চাটুজ্যে!

প্রণব চাটুজ্যের বাড়ীতে তাঁর গৃহিণী, ছোট ছেলে মন্দার আর মেয়ে রাকা। ছোট ছেলের বয়স তেইশ বছর, এম্ এ পাশ করেছে, এখনো চাকরী যোগাড় করতে পারেনি, বাপের কাছে সংস্কৃত পড়ছে, কাব্য পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা আছে। কন্যা রাকা লেখায় পড়ায় এ গ্রামে অদ্বীতিয়া হলেও, কেউ কোনোদিন জানতে পারেনি, বিদ্যায় সে কতখানি এগিয়েছে। সংস্কৃততে ছোট দাদার ভুল সে শুধুরে দেয়, অবশ্যি ইংরাজিটা দাদার কাছেই এখনো পড়ে।

তা'বলে মনে করবেন না, প্রণব চাটুজ্যে ইংরাজি কিছুই জানেন না। তিনি জানেন। সেকালের এনট্রান্স পাশ তিনি। আর সেকালের এনট্রান্স পাশের ইংরাজি বিদ্যে একালের এম্ এ পাশের কাছাকছি। এ সত্য যাঁরা সেকালের এনট্রাস পাশদের জানেন, তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। নিতান্ত দরিদ্র এই পরিবার, তবু এই বাড়ীতে একখানি দৈনিক ইংরাজি পত্রিকা এবং একখানি বাংলা পত্রিকা নিয়মিত আসে; কেন আসে,

তা শুনলে আপনি হয়তো অবাক হবেন। টাকা দিয়ে খবরের কাগজ কিনবার মত টাকা ওঁদের নেই, কিন্তু প্রণব চাটুজ্যে অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন ঐ উভয় পত্রিকাতেই, তাই পত্রিকার স্বত্তাধিকারিগণ সাগ্রহে কাগজ পাঠান তাঁর বাড়ীতে। এত বড় গ্রামটায় আর কোনো দৈনিক কাগজ আসে না। জেলা-সহর থেকে সপ্তাহে একখানা নিলাম ইস্তাহারের কাগজ আসে। তাই দিয়ে এ গ্রামের জমিদার-পরিবার খবরের ক্ষুধা মেটান। অবশ্য প্রণবদের বাড়ীর কাগজ যে-কেউ নিয়ে পড়তে পারে এবং অনেকে পড়েও।

প্রণব চাটুজ্যের বড় ছেলে জেলে—মেয়েটার আজও বিয়ে দিতে পারেন নি টাকার অভাবে নয়, অন্য একটা কারণ আছে; সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তাঁর সংসারের কয়েকবিঘা ধানী-জমি এবং ঝড়তি-পড়তি জমিদারীর যৎসামান্য খাজনা। এ ছাড়া দৈনিক কাগজে প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রায় প্রতিমাসেই পান কিছু কিছু। কোনো রকমে চলে যায়, সঞ্চয় কিছুই হয় না, বরং মাঝেমধ্যে অভাব হয়ে পড়ে। তবু ওঁর গৃহিনী কিছু জমিয়েছিলেন, কিন্তু গত পঞ্চাশের মন্বন্তর, তার পর কণ্ট্রোলের কল্যাণে জিনিষের মূল্যে বৃদ্ধি ওঁর জমান টাকাকটি শেষ করে এনেছে। উনি মেয়ের বিয়ের ভাবনায় ঘুমুতে পারেন না ভালকরে, কিন্তু প্রণব চাটুজ্যেকে দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে মেয়ের বিয়ের জন্য কোনো দুশ্চিন্তা তাঁর আছে।

কিন্তু চিন্তা উনিও করেন। সে চিন্তা ওঁর আদর্শ নিষ্ঠার চিন্তা। যে বজ্রকঠিন আদর্শের নিষ্ঠায় উনি নিজের জীবনকে

গঠন করেছেন ঠিক সেই আদর্শেই ছেলেমেয়েদেরও গড়েছেন। আদর্শের জন্যই বড় ছেলে আজ জেলে—নইলে ওঁর অভাব হয়ত এত বেশী হোত না। ছোট ছেলেকেও উনি আদর্শ রক্ষার জন্যই যা-হোক্ একটা চাকরী নিতে দেন নি, এবং মেয়েকেও যার-তার হাতে সম্প্রদান করবেন না আদর্শ রক্ষার জন্যই। ন... নশিবগঞ্জের রায়সাহেব তাঁর ছেলের জন্য রাকাকে চেয়েছিল বিনা পণে। ছেলেটিও ভালো, কলকাতায় সরকারী কণ্ট্রাক্টারী করে। কিন্তু প্রণব চাটুজ্যে রাজি হলেন না।

এমনি আরও দুএকটা সম্বন্ধ এসেছিল, উনি গ্রহণ করেন নি। এখন আর কেউ আসে না। গ্রামের লোকে ওঁর অসাক্ষাতে অনেক কিছুই বলে ওঁর জেদ এবং অহেতুক আদর্শের খেয়ালের সম্বন্ধে; কিন্তু ওঁকে দেখলে মাথা নোয়াবে না এমন ব্যক্তি এ গাঁয়ে কেন, এ তল্লাটে কেউ নেই।

যাত্রা শুনতে আসেন নি প্রণব চাটুজ্যে। পূজাপাট শেষ করে শোবেন। রাকার মা বললো—রোহিত ছাড়া পেয়েছে।

—হ্যাঁ, শুনলাম। এখানে এসেছিল নাকি?

—না! আজ হয়তো ক্লান্ত আছে। কাল সকালেই আসবে। সবাই তো দেখছি ছাড়া পেয়েছে; আমাদের অংশুর কোনো খবর পেলে না?

—কৈ! শুনছি, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। অংশুও হয়তো ছাড়া পাবে।

—কি জানি, ভগবান কি করবেন।—রাকার মা সুদীর্ঘ শ্বাসটা চেপে চেপে ছাড়লেন।

প্রণব চাটুজ্যে কোনো উত্তর দিলেন না। পুত্রবিরহ-কাতরা মাতার অন্তরকে অনর্থক সান্ত্বনা দিতে যাবার মত মূর্খতা তাঁর নেই। পাশ ফিরে শুলেন।

—রাকা গেছে যাত্রা শুনতে; ওকে ডেকে আনি।

—যাও।

প্রণব চাটুজ্যের সংক্ষিপ্ত উত্তর। রাকার মা আস্তে উঠে বেরিয়ে এলেন। যাত্রাস্থান খুব কাছে। ওঁরও ইচ্ছে যাত্রাটা কয়েক মিনিট শুনে আসেন। তাই বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এলেন। যাত্রা তখন খুবই জমে উঠেছে এবং ভাব-প্রবন কতকগুলি লোক হরিধ্বনি করে যাত্রাওয়ালাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করছে। রাকার মা এগিয়ে আসছেন পর্দা ফেলা যায়গাটার দিকে।

মধ্যরাত্রির পূর্ণচন্দ্র! সে-জ্যোৎস্নার এমন একটা যাদুকরী জ্যোতি আছে যা মর্ত্ত্যকে স্বর্গ করে তোলে। সেই জ্যোৎস্নার আলোতে অসংখ্য উপবিষ্ট জনারণ্যের মাঝের সরু পথটি ধরে উনি এগিয়ে আসছেন। সু-শুভ্র শাড়ী পরণে, আর দুহাতে দুগাছি শাঁখের শাঁখা। চাঁদের আলোতে সেই তুষারশুভ্র শঙ্খবলয় থেকে জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। একখানি সচল প্রতিমা এগিয়ে আসছেন যেন। প্রণব চাটুজ্যের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী!

মানুষের মন যে কি বস্তুতে গড়া, মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তাই শুধু বলতে পারেন। মানুষকে বোধ হয় সব থেকে মূল্যবান এবং শক্তিশালী বস্তু দেওয়া হয়েছে—এই মন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান

এই মনের আয়ত্তে! আর্য্য ঋষিরা এ সত্য জানতেন ; বর্ত্তমান বিজ্ঞানও প্রায় স্বীকার করেছে এই পরম সত্য। মনের অজ্ঞাত কিছু নাই ; মনই ঈশ্বরের বিশিষ্ট বিভূতি!

উনি এগিয়ে আসছেন ; রুক্মিণী বসেবসেই দেখতে পেল জ্যোৎস্নার আলোতে দূর থেকে দেখা ওঁর দিব্য-মূর্ত্তির কিছুই ভালো করে দেখতে পায় নি রুক্মিণী, তথাপি তার মনে হোল, ঐযে আসছেন, উনি নিশ্চয় ঐ মেয়েটির মা। অমন না হলে অমন মেয়ের মা হওয়া যায় না।

কিন্তু ওকে আ মিনিটও অপেক্ষা করতে হোল না সত্যভামার শ্বাশুড়ী অর্থাৎ এই জমিদার পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষ সম্মানিতা কর্ত্রীই উঠে একবারে দাঁড়িয়ে পড়লেন অভ্যর্থনার জন্য আগু বাড়িয়ে হাত ধরলেন গিয়ে।

—এসো ভাই, এসো।—ঠাকুরপো আসেন নি?

—না, উনি শুয়েছেন।—

—বড্ড দেরী করে এলে। ভারী সুন্দর গাইছে—আহা-হা!

—ঘরের কাজ সব সাম্‌লে এলাম দিদি! রাকা কোথায়? বসেছে!

—এই যে মা!

রাকা সাড়া দিল তার যায়গা থেকেই। রুক্মিণী নিঃসন্দেহ হলো তার অনুমান সম্বন্ধে। একটা সুন্দর দৃশ্য অভিনয়ের পর যাত্রার বিরাম এবং ঐক্যতান বাদন চলছে, রুক্মিণী দিদিকে শুধুলো—ঐ মহিলাটি কে দিদি, ঐ যাঁকে অত খাতির করে তোমার শ্বাশুড়ী বসালেন?

—উনি সম্বন্ধে আমার খুড়শাশুড়ী হন।

—ওঃ! আমি ভেবেছিলাম বুঝিবা গুরুঠাকরুণ। রুক্মিণী হেসে বললো!

এই কথাটার অভ্যন্তরে কোথায় ওর অন্তরের জ্বালা, কিসের জন্য এই বিদ্রূপের হুল, রুক্মিণীর ইংরাজিশিক্ষিত আধুনিক মন তার খবর রাখে না,—কিন্তু মন এমনই বস্তু যে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকে প্রকাশ করে দেয়; কিন্তু সত্যভামা সেদিকে লক্ষ্য না করে বললো—ওঁর স্বামী ঋষির মত মানুষ, আর উনি তাঁর যোগ্যা স্ত্রী। ওঁকে গুরু ঠাকরুণ বলা বেশি কিছু নয়। এই তল্লাটের বিশপঁচিশ খানা গাঁয়ের মানুষ ওঁদের প্রণাম করে যায়। কাল যাবি, দেখিয়ে আনবো ওঁদের ঠাকুরবাড়ী আর দুর্গাদালান। দেখলে মনে হবে, ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ দেখছিস্।

—এতো সুন্দর!

—হ্যাঁ!

যাত্রার আসরে আবার নট্-নটির যুগল আবির্ভাব হোল; সত্যভামা সেই দিকে মন দিল! কিন্তু রুক্মিণী শুধু ভাবতে লাগলো, ঐ রাকা নামে মেয়েটা খুব গরীব পরিবারের মেয়ে, কিন্তু খুবই বনেদি পরিবারের মেয়ে। এবং পাড়াগাঁয়ে বনেদীবংশের গৌরব এখনো আছে। অবশ্য আজকাল যেরকম ভাঙন আরম্ভ হয়েছে সমাজে, আর সেই ভাঙন যোড়াতালি দেবার জন্য যে-সব আন্দোলন চলছে, তাতে বনেদী আর কেউ বেশিদিন থাকবে না—তবে এখনো আছে। আরো দুচার বছর থাকবে।

এর মধ্যে রাকার বিয়েটা যদি কোনো খুব-ভালছেলের সঙ্গেই, ধরো—ঐ রোহিতের সাথেই যদি হয়ে যায় ?

মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতেই জ্ঞাত হয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

স্বর্গীয় অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে রোহিতাশ্ব প্রণব চাটুজ্যের বিশেষ স্নেহভাজন। প্রণবের ছেলে অংশুমালীর বাল্যবন্ধু রোহিত, দুজনের কর্ম্মপদ্ধতিও এক, আদর্শও এক। প্রণব চাটুজ্যে দুজনকেই শিক্ষা দিয়েছেন ছোট বেলা থেকে। বছ কয়েক আগে এই গাঁয়ের প্রায় পাঁচ-সাতজন যুবককে রাজবন্দী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের মধ্যে অংশু এবং রোহিত ছাড়া অন্য সকলেই দুচার মাসের মধ্যে ফিরে এসেছে। ওরা এখনো ছিল সরকারের অতিথি হয়ে। রোহিত গতকাল ফিরেছে; অংশুর এখনো কোনো খবর আসে নি।

রোহিতের বিধবা মা তাকে মানুষ করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন প্রণব চাটুজ্যে। অবশ্য রোহিত কলকাতারও কলেজে উচ্চশিক্ষাও লাভ করেছে অংশুর সঙ্গেই, তবে সে ব্যয়ভারও বহন করেছেন প্রণব চাটুজ্যে। রোহিতের ঘরে তার বিধবা মা, ছোট একখানা মাটির কুড়ে ঘর আর বিঘে পাঁচ-সাত ধান-জমি ছাড়া কিছু নাই। এই ক'বছর সেই ধান জমির আয়েই ওর মার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়েছে।

০

রোহিত গাঁয়ে ফিরেছে কাল সকালে, অথচ কাল সারাদিন এবং আজ এ পর্য্যন্ত প্রণব চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা করেনি—করতে পারেনি। প্রণব চাটুজ্যে রোহিতের পিতার কাজ করেছেন;

অথচ রোহিত গ্রামে এসে তার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যটাই এখনো করতে পারলো না। ওর অন্তরটা যন্ত্রনায় জ্বালা করছিল যেন।

কিন্তু সমস্ত সংকোচ, সব ভয়ভাবনা সবলে ঠেলে ফেলে ও যাত্রা করলো প্রণব চাটুজ্যের বাড়ীর দিকে আজ সকাল আটটার সময়। এইটাই ঠিক সময়; প্রণব চাটুজ্যে প্রাতঃসন্ধ্যাদি সেরে ঠাকুর ঘরে একটু বসবেন—জিজ্ঞাসু কেউ এলে উপদেশ দেবেন।

রোহিত দুর্গাদালানের ভাঙ্গা একটা থামের কাছে এসে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, উনি বসে আছেন। ওঁকে অতিক্রম করে কাকিমার কাছে, একেবারে অন্দরে যেতে পারলে খুবই সুবিধা হোত, কিন্তু সে যাবে কোন্ দিকে? পথ মাত্র এই একটি। খিড়কী দিয়ে পথ আছে, কিন্তু সে পথে মেয়েরা স্নান করতে যায়। রোহিতের সেদিকে যাওয়া চলেনা।

এতখানা বেলা হয়েছে, কাকীমাকে দেখা যাচ্ছেনা কেন? হয়তো ঘরের মধ্যে উনি কাজে ব্যস্ত। কিম্বা যাত্রা শোনার জন্য রাত জেগে এখনো ঘুমুচ্ছেন। নাঃ! প্রণব চাটুজ্যের বাড়ীতে প্রলয়ের দিনও মানুষ সূর্য্যের আগে বিছানা ছাড়বে—এই নিয়ম এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার দিন প্রলয়েই হবে।

আশোক গাছটা দেখা যাচ্ছে। লাল ফুলের গুচ্ছে আর সবুজ পাতার কোমলতায় ওটা যেন অষ্টাদশী তরুণীর মত সুন্দর হয়ে উঠেছে। কতদিন রোহিত দেখেনি ঐ গাছটি। মস্ত বড় হয়ে উঠেছে ওটা। বাঃ কি সুন্দর দেখাচ্ছে! অংশু থাকলে কবিতা লিখতে পারতো!

আর একটু এগুলো রোহিত ; উনি বসে আছেন, সামনে খোলা প্রকাণ্ড [illegible] পুঁথি, কে জানে। রোহিতের পা আর চলতে চাইছে না। ভয়ে বুকখানা গুরুগুরু করে উঠলো। কিন্তু পেছন ফেরাও চলে না আর। যা হয় হবে, রোহিত এগিয়ে এল।

আ-ভূমি নত হয়ে পড়লো চরণে। চোখ তুলে চাইলেন প্রণব চাটুজ্যে—কল্যাণ হোক !—ওঁর সংক্ষিপ্ত আশীর্ব্বাদ ঝরলো—।

রোহিতকে কি উনি চিনতে পারেন নি নাকি ? এ রকম সর্ব্বসাধারনের জন্য উচ্চার্য্য আশীর্ব্বাদ তো রোহিতের জন্য নয় ! হয়তো উনি চোখ তুলে দেখেনই নি এখনো। রোহিত ভয়টাকে জয় করে আস্তে বললো,—আমি অপরাধ করেছি...! ক্ষমা....!

উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে চাইলেন প্রণব চাটুজ্যে। সে চোখের জ্যোতির্ম্ময়তা মানুষকে কখনো ভীত করে না—আশ্রয়ই দেয়। তবু রোহিত ভীত শশকের মত মাথাটা মাটির দিকে নামিয়ে দিল।

—ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন নাই রোহিত। দুর্ভাগা পিতারা পুত্রকে ক্ষমাই করে থাকে। কিন্তু আমার আদর্শ থেকে তোমরা চ্যুত হলে, এর থেকে বেদনাদায়ক আমার কাছে কিছু আর নেই !

রোহিতের চোখদুটো থেকে বড় বড় দু'ফোঁটা জল বেরিয়ে এল,—নিজের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রনা ভুলে এই চার বছর শুধু ভেবেছি, আমরা আপনাকে মস্ত বড় দুঃখ দিলাম। অযোগ্য সন্তানরা বাবা-মাকে কষ্টই দিতে জন্মায় খুড়ো মশাই !—কেঁদে ফেললো রোহিতাশ্ব !

এ ক্রন্দন শিশুর নিষ্কপট আত্মসমর্পনের ক্রন্দন। প্রণব চাটুজ্যে দেখলেন আধমিনিট-খানেক। ওঁর মুখে শিবের মত সুন্দর হাসি ফুটে উঠলো; বললেন,—কাঁদিস না। পথ তোদের ভুল হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য তোদের সেইখানে, যে ধ্রুবনক্ষত্রের পানে আমি আজ দীর্ঘ চল্লিশ বছর তাকিয়ে আছি। আমার পথে তোরা যাসনি, আমার লক্ষ্যের পানে গিয়েছিস, এই আমার বড়ো সান্ত্বনা। পথের ভুল দুঃখের আঘাতে তোদের শুধরে যাবে।

আর একবার প্রণাম করলো রোহিত পদস্পর্শ করে। বললো, —আশীর্ব্বাদ করুণ, আর যেন ভুল পথে না যাই। দেশ-জননীর শৃঙ্খল-মোচনের জন্য নিজেকে বিশৃঙ্খল করার দুর্ব্বলতা যেন না ঘটে আর!

—দেশজননী সেই আশীর্ব্বাদ দান করুন তোদের। কিন্তু ভুলটা কোথায় হয়েছে, বুঝতে পারছিস্?

—হ্যাঁ, হিংসাত্মক কার্য্যদ্বারা রাজশক্তিকে জয় করতে যাওয়া।

—না; তোদের ভুল হয়েছে নিজেকে হিংস্র করে তোলা! এই দেশের আত্মা হিংসার বিরোধী। দেশাত্মবোধকে রক্ষা করবার জন্য দেশের আত্মার বিরোধী কার্যকলাপ এই দেশের আত্মাকেই হত্যা করবে। এ দেশের আত্মা সাম্য-মৈত্রী-প্রীতির বন্ধনেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পাতায়। মানুষকে এ দেশ চিরদিন ঈশ্বর জ্ঞান করে এসেছে, ভূতে ভূতে ভগবান দর্শন করেছে; মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্বরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ, এই দেশ চিরদিন তারই উপাসনা করেছে। সেই আদর্শ থেকে চ্যুত

হওয়ার অর্থ, এই দেশ থেকে চ্যুত হওয়া, বিদেশী এবং বিধর্ম্মী হয়ে যাওয়া !

উনি থামলেন ! রোহিতের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার মত ক্ষমতা জোগাচ্ছে না, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ, একটা জিজ্ঞাসা উঁকি দিচ্ছে। উনি যেন বুঝতে পেরেই বললেন, —স্বদেশকে শৃঙ্খল মুক্ত করবার জন্য পৃথিবীর যে কোন দেশের মানুষ যুদ্ধই করে কিন্তু যুদ্ধ হিংসা নয়। যুদ্ধ করবার শক্তি যদি তোদের থাকতো এবং করতিস, তা হলে আজ বীরের বিজয়াভিনন্দন দিয়ে আমি কৃতার্থ হতাম। তোরা তো যুদ্ধ করিস নি, করেছিস গুপ্তাঘাত; ওকে হিংসা বলে, আর ওর আশ্রয় নেওয়ার অর্থই হিংস্র হয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য তার যতই মহৎ হোক, নিজেকে গুপ্ত ছুরিকার বশবর্ত্তী করার মূলে আছে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করা। যুদ্ধের আভ্যন্তরীন অর্থ, ন্যায় এবং ধর্ম্ম সঙ্গত উপায়ে অন্যায় এবং অধর্ম্মের প্রতিবাদ করা এবং তাকে দমন করা। কিন্তু তোরা কি করেছিস ? গুপ্তভাবে স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করেছিল আর সেই চেষ্টার মধ্যে লুকানো ছিল গুপ্তঘাতকের মনোবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিকে স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়ে সমর্থন করতে যাওয়া আরো অন্যায় !

নিঃশব্দে বসে রইল রোহিতাশ্ব। উনিও কিছুক্ষণ থেমে থাকলেন। ছোট ছেলে মন্দার কোথায় বেরিয়েছিল, ফিরে এসে বাপের পিছনে দাঁড়িয়ে কথা শুনছে। এতক্ষণে আস্তে এগিয়ে এসে বললো,—

—সিপাহী বিদ্রোহ, তারপর উনিশ শ' পাঁচ সাল থেকে…

—হাঁ, উনিশ শ' পাঁচ সাল থেকে বিয়াল্লিশ সাল পর্য্যন্ত যে সন্ত্রাসবাদের জন্ম আর তার পুষ্টি, সেইটাই প্রমাণ করছে, ও কাজ ভারতের বীর ধর্ম্মের, ক্ষাত্র ধর্ম্মের উন্মেষক। ও কাজের পিছনে কোটি কোটি ভারতবাসীর সমর্থনও ছিল—ভারতমাতারও সমর্থন ছিল। ওর মধ্যে বীরত্ব এবং মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু গোপনতার আশ্রয়ে সে মহৎ উদ্দেশ্য কলঙ্কিত হয়েছিল। তবু নিরুপায় যারা, তাদের ঐ ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু তোরা তো তাঁদের পথ গ্রহণ করিস নি—তোরা হিংস্রতা আশ্রয় করেছিলি!

—তা হলে কি গান্ধীজির অহিংসা এবং অসহযোগকেই এক-মাত্র পথ বলেন আপনি? সে পথেও তো এই দীর্ঘদিন চলে কিছুই হোল না।

—একমাত্র পথ নয়, তবে ওটা একটা ভাল পথ। কিন্তু পথের বাঁকে বাঁকে যে সতর্কতা, যে দূরদৃষ্টি, যে ঐকান্তিকতা প্রয়োজন, আমাদের সৈন্যদলে, এমন কি সেনাপতিদলেও তার অভাব দেখা গেছে বারবার। এই জন্যই এত দীর্ঘকাল চলেও ওপথে এত বিড়ম্বনা, এত নৈরাশ্য, এত বিচ্ছিন্নতা।

—এখনো কি ঐ পথটাই আমাদের পথ—বলছেন? রোহিত বলল।

—বলছি, ঐ পথে চ'লে আমরা স্বরাজ সাধনার পথে বহুদূর এগিয়েছি, এখন পথ পরিবর্ত্তন করতে গেলে আমাদের বিস্তর ঘুরতে হবে, অনেক বাধা বিপত্তি আবার পার হতে হবে, হয়তো সেই পথেও আমরা সাফল্যে পৌঁছুতে পারব না; তার চেয়ে যে

পথে এতদূর এসেছি, সেই পথই অবলম্বন করা উচিত। অবশ্য—উনি আধ মিনিট থেমে থাকলেন—ও পথে অনেক ভুল ভ্রান্তি ঘটেছে, অনেক ত্রুটি বিচ্যুতিও আছে, কিন্তু এতবড় একটা জাতির এত দীর্ঘদিনের পরাধীনতা ঘোচাতে গেলে ওরকম ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। এ জাতির পরাধীনতার ইতিহাস অসংখ্য ভুলের ইতিহাস। সেই সাগর প্রমাণ ভুলে আরো কয়েকটা ভুল না হয় যোগ হোল। যদি কোনদিন এ জাতি আবার স্বাধীন হয়—হবেই, উনি কথাটায় জোর দিলেন—তা হলে এই সব ভুল আর না হবার উপায় সে করবে সেদিন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ! রোহিত আস্তে বলল—অং... খবর পান নি?

—না! যাও, তোমার কাকিমার সঙ্গে দেখা কর গিয়ে।

রোহিত ভেতরে চলে এলো। কাকিমা রান্না ঘরে রয়েছেন। রাকা কোথায় আছে, কে জানে। রোহিত বাইরে থেকে ডাক দিল,—কাকিমা!

—আয়! উনি বেরিয়ে এলেন। রোহিত প্রণাম করলে ভূমিষ্ঠ হয়ে।

—রাকা কোথায়?

—নাইতে গেল! বোস, একটু কিছু খা দেখি।

—হ্যাঁ! দাও পায়ের ধূলো! রোহিত পদতল থেকে হাত দিয়ে ধূলো নিল। জিভে দিয়ে বললো—তোমার আশীর্ব্বাদে ওঁর ক্ষমা পেলাম কাকিমা।

—ক্ষমা উনি করবেনই বাবা। উনি আজন্ম ক্ষমাশীল

কিন্তু বড়ঃ ব্যথা উনি পেয়েছিলেন! তোদের যাওয়ার পর সাতদিন কারো সঙ্গে কথাই বলেন নি, তার পর একদিন বললেন, —'ওদের মানুষ করতে চেয়েছিলাম, বনের ভালুক হয়ে উঠলো! উঃ!'—এর বেশি আর কোনোদিন কিছু উনি তোদের সম্বন্ধে বলেন নি!

কী গভীর বেদনা যে উনি পেয়েছেন, রোহিত তা ভালই বুঝেছে, কিন্তু সেদিন ওরা সে কথা ভেবে দেখেনি। সেই দিনের বৈপ্লবিক মন আজকার নীড়ফেরা মনের চোখে সত্যিই অন্য রূপে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সেদিনকার মনও রোহিতের মন এবং রোহিতের আদর্শনিষ্ঠ স্বদেশিকতায় সমৃদ্ধ বীরের মন। কিন্তু উনি তো সে মনকে হিংস্র এবং কদর্য্য আখ্যায় অভিহিত করলেন।

ওঁর যুক্তিকে অস্বীকার করবার কিছুই আজ নাই রোহিতের। যদি সে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসতো তা হলে তর্ক করবার মত কিছুটা থাকতো। বন্দী হয়ে, বিপর্য্যস্ত হয়ে, বহু দুঃখের পর তারা মুক্তি পাচ্ছে, এবং সে মুক্তিটুকু লাভ হয়েছে ঐ অহিংস মহামানবের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের স্বাধনার ফলেই। হিংসাবাদকে সমর্থন করবার মত যুক্তি কোথায় আজ?

কিন্তু ওসব এখন আর ভাবতে চায় না রোহিত। ওর মন যেন অত্যন্ত হাল্কা হয়ে গেছে প্রণব চাটুজ্যের ক্ষমা লাভ করে। পাখীর মত উড়ছে যেন মনখানা। কাকিমাকে মহানন্দে বললো, —পায়ের ধূলো খেলাম কাকিমা, ওবেলা এসে ভাত ডাল খাব। কাল থেকে আজ এ পর্য্যন্ত হাল্কা মনে একবার হাসতে পারিনি,

ভাবছিলাম,—রাজসরকার থেকে মুক্তি পেলাম, কিন্তু পালকপিতার কাছ থেকে মুক্তি পাব না। হোলির সময় নাচানাচি, যাত্রার আসরে ঘুরে বেড়ানো, ওর মধ্যে আমার এতোটুকু প্রাণ ছিল না। সময় কাটাবার জন্যই অমনি করে হুল্লোড় করছিলাম। এবার একটু সত্যিকার হাসিখেলা করে আসি।

—কোথায় যাবি ?

—গ্রামের কারোর বাড়ী যাইনি কাকিমা ! রাস্তাতেই সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ঐ হোলীর সময় আর যাত্রার সময় ; যাই !

উনি আর কিছু বললেন না। রোহিত বেরিয়ে যাচ্ছে, খিড়কীর পথ বেয়ে উঠোনে ঢুকলো রাকা। স্নান করে আসছে, শাড়ীটা ভিজে, চুল গুলো খোলা। রোহিত একচোখ চাইল, তার পরই সদর দিয়ে বের হয়ে গেল। রাকার সঙ্গে কথা ওর কাল রাত্রেই হয়েছে ; অত্যন্ত কম কথা, কিন্তু কথাটা অর্থপূর্ণ। জ্যোৎস্নার আলোতে রাকাকে ও চিন্‌তে পারে নি প্রথমটা। ভেবেছিল কোনো মেয়ে একা একা এসেছে যাত্রা শুন্‌তে, অই ভিড় ঠেলে পথ করে দিতে এসেছিল, কিন্তু রাকাই প্রণাম করলো !—কে ? রোহিত প্রশ্ন করেছিল অবাক হয়ে।

—প্রণাম করলেই আশীর্ব্বাদ দিতে হয় ; কে, তা জানবার কি দরকার ?

বলেই রাকা চলে এসেছিল পথ করে। তেমনি দুষ্টু আছে, আর তেমনি ঠোঁট্‌কাটা। কিন্তু মস্ত ডাগর হ'য়ে উঠেছে। লম্বা একটা ভর যোয়ান মেয়ে। বিয়েও হয়ে গেছে নাকি ? না, তা হলে মা আসবামাত্র সে কথা বলতো। কিন্তু মা বলছে

কি করে? ওদের সম্বন্ধে কোনো কথাই কাউকে জিজ্ঞাসা করে নি রোহিত, শুধু মাকে শুধিয়েছিল, অংশু ছাড়া পেয়েছে কি না। উত্তরে মা শুধু বলেছিল, 'না।' তুই যা ওখানে, এখুনি যা!

কিন্তু রোহিত যেতে পারে নি; কাল সমস্ত দিন সে ছটফট্ করেছে মনের যন্ত্রণায়। আজ যেন মনটা অসাধারণ রকম ভাল লাগছে, আরাম লাগছে, কিন্তু রাকার কপালে তো সিন্দূর দেখা গেল না; তা হ'লে বিয়ে হয় নি, নিশ্চয় হয় নি! আচ্ছা, বিকালে ভাল করে জানা যাবে। রোহিত বেরিয়ে গেল গ্রাম-পথে।

রুক্মিণী বেরুবে, তাই সাজ-সজ্জা করছে। গত কাল রাত্রে দিদি বলেছে ঐ ভগবতীর মত সুন্দর মহিলাটির বাড়ীতে তাকে নিয়ে যাবে। সকাল থেকে রুক্মিণী অন্ততঃ বার দশ তাগাদা দিয়েছে দিদিকে। কিন্তু দিদি এখানে বউমানুষ, যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাবার তার উপায় নাই এবং শাশুড়ীর অনুমতি ছাড়া তো নয়ই। শেষে রুক্মিণীই গিয়ে দিদির শাশুড়ীকে বলল, সে একবার রাকাদের বাড়ী বেড়াতে যেতে চায়। উনি অনুমতি দিলেন কিন্তু বিকালের দিকে যেতে বললেন। অথচ রাকাদের বাড়ীটা অত্যন্ত কাছে। এত কাছে যে জোরে, ঢিল ছুঁড়লে তাদের অশোক গাছটার উপর পড়তে পারে। কুটুম্ববাড়ীতে এসে রুক্মিণীর স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়ে গেছে; তারপর অনালাপী কারও বাড়ীতে অনাহুত হয়ে যাওয়াও অনুচিৎ, তাই কোনো রকমে সে বেলা টুটো পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করেছে! তার পরই উঠে চুল বাঁধতে বসলো। তার সাজ-পোষাক শেষ করতে ঘণ্টা দুই অন্ততঃ লাগবে।

দোলের মেলা এখনো শেষ হয় নি,—তিনদিন থাকে এখানে মেলা, তার সঙ্গে যাত্রাও চলে। দিনের বেলা কবিগান হয়—এখনো হচ্ছে। বাড়ীর সামনেই গত রাত্রের যাত্রার ফাঁকা আসরে পাল্লা দিয়ে কবিগান চলছে। হাজার লোক শুনছে। কিন্তু কৈ? ওতো আসেনি—রোহিত!

কাল রাত জেগে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। রুক্মিণীরও কিছুক্ষণ ঘুমানো উচিৎ ছিল, না-ঘুমিয়ে চেহারাটা খারাপ দেখাবে। দিদি আর দিদির শাশুড়ী, এমন কি জামাইবাবু পর্য্যন্ত বার বার বললো তাকে ঘুমুতে। বললে কি হবে! রুক্মিণীর ঘুম এলো না। কি যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা তার মনের মধ্যে—কে জানে! রুক্মিণী শোবার ঘরের জানালা খুলে কবি শুনতে বসেছিলো; বেশ লাগছিল বাদাবাদি তরজাগুলো, কিন্তু সবই পুরাণ-কথা নিয়ে কাব্য করছে ওরা, রামায়ণ মহাভারত তো আছেই, তাছাড়া বেদ, বেদান্ত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ইত্যাদি অষ্টাদশ পুরাণই ওদের তরজার বিষয়; রুক্মিণী ঠিক মত বুঝতে পারছিল না। তবু বেশ লাগছিল ওর। ফকির বাউরী বেশ নাচে আর গলাটাও তার মিষ্টি। সে যখন গাইল,—

'কালীয়ায়···নদীয়ায় চাঁদ উঠেছে রে—নদীয়ায়····

চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে রে—নদীয়ায়—ভেসে যায়···ভেসে যায় বসন ভূষণ লাজ আভরণ

কূল মান ধন রে...কালীয়ায়···'

ভারী মিষ্টি লাগছিল রুক্মিণীর। কোথায় কোন্ কালিন্দীতে কালীয়া চাঁদ উঠেছে, তার জ্যোস্নাজোয়ারে নারীর বসন-ভূষণ লাজ আভরণ সব ভেসে যাচ্ছে। ছুটছে সব গোপাঙ্গনা অর্দ্ধউলঙ্গ হয়ে সেই ব্রজরাখালের গোচারণ ভূমিতে, যমুনাকূলে, কদম্বমূলে। কী যে সুন্দর একটা ভাব জেগে উঠছে রুক্মিণীর মনে…আহা, স্বর্গীয়! কিন্তু পৌরাণিক গল্প ওর বিশেষ জানা নেই, তাই যাকে বলে 'ফলো' করা, তা করতে পারছিল না ঠিক মত। ফকিরের পর তার প্রতিদ্বন্দ্বী হরিচরণ এসেই আরম্ভ করলো ঃ—

শুনো যদুপতি, দেহে পঞ্চ ভোতি…

ওহে কৃষ্ণচন্দ, তোমার পিতা নন্দ

মাতার নাম যশোমতি—শুনো যদুপতি…

খুব মন্দ লাগছিল না রুক্মিণীর কিন্তু তার পরেই সে কেচ্ছা আরম্ভ করলো—"কোথাকার বেভোল্লা, দিতে আইছে পাল্লা,

ঘরে নাই পোড়া মুড়ি, খেতে চায় রস্‌গোল্লা

কোথাকার বেভোল্লা…"

রুক্মিণী জানালা বন্ধ করে উঠে গিয়ে চুল বাঁধতে বসলো। কিন্তু এখনো বিস্তর বেলা। দিদি হয়তো মারতে আসবে রুক্মিণীকে এত বেলা থাকতে চুল বাঁধতে দেখলে। কিন্তু রুক্মিণী করবে কি? ভাল একখানা বই নাই যে পড়ে; একটা সঙ্গী নেই যে গল্প করে। বিরক্ত হয়েই রুক্মিণী তার চুলের আগাটা কামড়ে ধরলো দাঁতে। বেনীকে ফণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি; রুক্মিণী সেই ফণীকে কামড়ে ধরেছে—তাহলে রুক্মিণী ফণীভূক ময়ূর!—কথাটা ভাবতেই ওর ঠোঁটে হাসি ঝরে পড়লো

একঝলক। দাঁত আলগা হওয়ায় বেণীটা খসে গেল মুখ থেকে। যাঃ, ফণী যে পালিয়ে যাচ্ছে! রুক্মিণী আবার ধরলো বেণীটা খুব করে চেপে।

জামাইবাবু ওপরে ঘুমুচ্ছেন; নাক ডাকছে জামাইবাবুর। রাত জাগার ঘুম। ওরা কি আর এখন উঠবে! রুক্মিণী দোতলার বারান্দায় এল বেণীটা খুলতে খুলতে—পূর্ব্ব দিকে দূরে একটা অশথ গাছ, আর এইতো, খুবই কাছে দেখা যাচ্ছে সেই অশোক গাছটার আগা!

ওরাও ঘুমুচ্ছে হয়তো। কে আর রুক্মিণীর মত এমন ছটফট করছে, বলো? কিন্তু ঐ মেয়েটা যদি জানে যে রুক্মিণী তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কি রকম ছট্‌ফট্‌ করছে, তাহলে ও কি ভাববে? হাসবে। ওর আনন্দ হবে রুক্মিণীর অবস্থা দেখে! না! রুক্মিণী এতটা আগ্রহ দেখাবে না। কি এমন দায় তার?

রুক্মিণী খোলা চুলগুলো নিয়েই শুয়ে পড়লো গিয়ে বিছানায়। চুল ওর খুব লম্বা নয়, কিন্তু বেশ কুঞ্চিত আর কালো। মুখের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশেই ড্রেশিং টেবিলটার বড় আয়না। রুক্মিণীর শায়িত মূর্ত্তিটা চমৎকার দেখাচ্ছে আয়নায়। রুক্মিণী দেখলো, দেখে মুগ্ধ হোল; নার্সিসাসের গল্পটাও মনে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু রুক্মিণী নার্সিসাস নয় —সে রুক্মিণী, তাই ভাবলো, এই রকম ভাবে তার থাকার সময় যদি ও একবার এসে দেখে। ও অর্থাৎ রাকা!—না-না-না, তাকে এ-রূপ দেখিয়ে কি হবে? ও, অর্থাৎ ঐ রোহিতাশ্ব। যে দুদিন ছিল রুক্মিণীদের বাড়ীতে, যাকে রাত দুটোর সময় রুক্মিণী

জনমঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাকে টিকিয়ে রাখা কি কষ্টকর। তাই দুঃখটাকে সে সামলে নিয়ে বললো—অংশু আসবার আগেই ওটাকে ঠিক করে ফেল।

—হ্যাঁ! আজই বিকালে একটা মিটিং করে তোমাকেই সেক্রেটারী করে দেওয়া হোক।

কথাটা অভয় বললো বটে, কিন্তু সেক্রেটারীর পদত্যাগ করবার তার ইচ্ছে নাই; এ সত্য রোহিত জানে, তাই হেসে বললো,—সেক্রেটারী তুমিই থাক অভয়; তাতে আমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না! তবে আমি যে কাজ করতে বলবো, তা তোমাকে করতে হবে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়!—অভয় সোৎসাহে বললো এবং বিকালে মিটিংএর আগে তার বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রন করলো রোহিতকে। চা অবশ্য মিটিংএর সব মেম্বারকেই সে খাওয়ায়, তবে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় দফা।—অভয় সম্পন্ন গৃহস্থ; এবং নিজেই তার বাড়ীর মালিক।

রোহিত কিন্তু মার হাতের তৈরী চা এক কাপ খেয়েই বেরুলো। বেলা তখন তিনটে, পল্লীতে এত বেলা থাকতে কেউ চা খায় না—তা হোক, অভয়ের বাড়ীতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসা যাবে। খাতাপত্র দেখতে হবে।

অভয় তৈরী ছিল; রোহিতকে রাস্তা থেকেই অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে! মস্ত বড় বাড়ী অভয়ের। ওর বাবা ভালই সম্পত্তি রেখে গেছেন তার জন্য এবং ভাল একটা বউ-ও! বউটার বাপের বাড়ী খুব কাছেই কোন একটা গাঁয়ে;

বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। বাঙালী মেয়ের সুকোমল সৌন্দর্য্য ওর সর্ব্ব অবয়বে। বয়স বছর কুড়ির বেশি হবে না; ছেলে মেয়ে এখনো হয় নি!

ওর বিয়েটা হয়েছে রোহিতের জেলে থাকার সময় এবং সেই সময়ের মধ্যেই অভয়ের বাবাও মারা যান। পিতৃবিয়োগের পর অভয় বৌকে এনে সংসারটা নিজের মনের মত করে গুছিয়ে নিয়েছে। বর্ত্তমানে সে গ্রামের কন্ট্রোলের দোকানের বড় কর্ত্তা এবং তারই বার-বাড়ীর একটা ঘরে, লাইব্রেরী ঘরের পাশেই গ্রামের রেশনের দোকান। দোকান অবশ্য সে নিজে দেয় না—অন্য লোক আছে, কিন্তু ভেতরের ব্যবস্থায় তারই সিংহ-ভাগ।

চিনি, কেরোসিন, কাপড় কিছুই পাওয়া যায় না। সরষের তেল তো ঘিএর ডবল দামে উঠেছে, আর ঘি অন্তর্হিত। দালদার মত জিনিষেও ভেজাল। না খেয়ে না খেয়ে মানুষগুলো নিরাপদে নিবীর্য্য হচ্ছে আর বৃটিশ সিংহের সুশাসনের সুব্যবস্থা করছে—ঠিক সেই সময় অভয়ের ঘরে কোন অভাব নেই। বরং প্রাচুর্য্যের অতিরিক্ত জিনিষ তার ঘরে। চা, চিনি, কেরোসিন, কাপড় তো তুচ্ছ কথা, অভয়ের বাড়ীতে এই মহা-মাগ্‌গির বাজারেও আপনি খাঁটি ঘি আর গমের ময়দা পাবেন, সরষের তেল এবং সাবুদানা, আর সুজি পাবেন, হরলিক্স থেকে ফটোফিল্ম পর্য্যন্ত পাবেন—খুব গোপনেই পাবেন, শুধু দামটা পাঁচগুণ লাগবে।

পয়সা খুবই আসছে অভয়ের হাতে এই বছর কয়েক, কিন্তু দুর্ভাগ্য, না—সৌভাগ্যই, পয়সা বেশী সে জমাতে পারছে না। এতবড় সুবিধা ঈশ্বর করে দিয়েছেন—ব্ল্যাক মারকেট অর্থাৎ

কিনা, 'আঁধারে' বাজার' আর সেই বাজার একা অভয়ের আয়ত্তে, তবু অভয় হাজার কয়েকের বেশী কামাতে পারলো না—আর যাকিছু কামালো, তার অর্দ্ধেক গেল খরচ হ'য়ে। খরচটা হয় খাওয়ায়। হ্যাঁ, অভয় ভোজন-বিলাসী, ভোর থেকে তার খাবার চাই, লুচি, পরোটা, ডিম, মাছ, মাংস ... চাই-ই, মাঝে মাঝে বিশেষ মূল্যবান খাবারও তার দরকার হয়। গোপনে, খুবই গোপনে খায় অভয়। ওর বৌ ছাড়া কেউ আজ পর্য্যন্ত সে কথা জানে না। বৌটা জানে, জান্‌তে বাধ্য হয়, কারণ, সেই রকম রাত্রে অভয় গভীর ভাবে ভালোবাসে বৌটাকে, যার দাগ ওর পিঠে থেকে যায় পরবর্ত্তী দু'চার দিন। কিন্তু মেয়েটা এত ভাল যে একটু কাঁদে না পর্য্যন্ত! নির্জ্জন ঘরে নীরবে সে অভয়ের ভালবাসাটা উপভোগ করে। কারণ পিঠে দাগ বসিয়ে দিয়েই অভয় বাড়ীর বাইরে কাদের যেন বাড়ী বেড়াতে চলে যায় রাত্রের মত। অবশ্য পরদিনই অভয় তাকে পুরস্কার স্বরূপ একটা নতুন গহনা, কিম্বা নতুন কাপড়, না হয় কিছু নগদ টাকা ঘুষ দেয়। চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জমা না করায় বৌটার লাভই হয়।

মাঝে মাঝে বৌটার ছোট ভাই আসে বাপের ঘর থেকে। বড্ড খারাপ অবস্থা ওর বাপের। ভাইএর হাতে কিছু কিছু দিয়ে পাঠায় বাপ-মাকে, অবশ্য অভয়কে লুকিয়ে।

অভয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় বৌটা খুসী কি অখুসী হয়েছে, তা ও নিজেই জানে না। লোকে দেখে, অভয়ের বৌ খুবই ভাগ্যবতী মেয়ে। ও আসার পর থেকে অভয়ের বাড়ী ধনে ধান্যে উপচে পড়ছে, গায়েও নিত্য নূতন গয়না উঠেছে বৌটার,

সোনার দর যখন একশো দশ টাকা ভরি। এবার ওর কোলে চাঁদের মত একটি খোকা হলেই হয়। কিন্তু গভীর রাত্রে অভয়ের বৌ যখন পিঠের ব্যথাটা চেপে বালিশে মুখ গুঁজে কান্নাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করে তখন নিজকে তার কতখানি সুখী মনে হয়—সেই জানে। অবশ্য সে জানে যে সকালেই পুরস্কার পাবে। কিন্তু সুখ-বস্তুটা পুরস্কারের সঙ্গে বাক্ এবং অর্থের মত যুক্ত নয়। তাই পুরস্কারের প্রলোভনকে ছাড়িয়ে পিঠের কথাটাই তার মনে জাগে।

কিন্তু স্বাস্থ্য বটে মেয়েটার। মাসে অন্ততঃ চার-পাঁচদিন অমন সাংঘাতিক আদর ভোগ করেও তার শরীর এতটুকু ভাঙেনি। চক্‌চক্ করে গায়ের চামড়া; পুরন্ত বুক কাঁচুলের আবরণ মানে না; গুরু নিতম্ব দিনে দিনে গুরুতর হয়ে ওঠে। বিকালে চুল বেঁধে কলসী কাঁখে ও যখন গা ধুতে যায় শিব-সায়রে,—গাঁয়ের হেন মনিষ্যি নাই যে বলে না—বাঃ, বেশ বৌটি অভয়ের!

"বেশ বৌটি!" কথাটা পাত্রভেদে অবশ্য বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়—কিন্তু ঐ একটা কথাই বলে তারা সকলে। অভয়ের বৌ-ভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এটা ঈর্ষা ওদের। কিন্তু বৌ-টা অভয়েরই একচেটিয়া। ঈর্ষা সেক্ষেত্রে অকেজো।

রোহিতকে ও কোনো দিন দেখে নি। আজই সকালে স্বামীর কাছে শুনেছে—রোহিত নামক তার এক বন্ধুকে চা দিতে হবে।

—কে রোহিত?—জিজ্ঞাসা করেছিল ও।

—রোহিত! এই গাঁয়ের সেরা ছেলে রোহিত মুখুজ্যে। চার

বছর জেল খেটে এল। ময়না নদীর ওপার ঐ যে গো রেলের পুলটা, তোমার বাপের বাড়ী থেকে তো দেখা যায়—ঐটা কে উড়িয়ে দিয়েছিল জান? ঐ রোহিত আর অংশুদা। আমরাও ছিলাম। (শেষের কথাটা মিছে কথা, বৌটা তা বোঝে!)

—অঃ! স্বদেশী করেছিল—না কি?

—হ্যাঁ! শুধু স্বদেশী? স্বদেশী ডাকাতি পর্য্যন্ত! ইংরাজকেই আমরা তখন বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, এ দেশে পুরুষ কেমন আছে। পুরুষ তো নয়, পুরুষ-সিংহ! মরদকা বাচ্চা! আসুক না রোহিত, দেখবে কি রকম চেহারা!

বৌটা আর কিছু শুধোয় নি। স্বদেশী ডাকাত একজন আসবে, লোকটা দেখতে নিশ্চয় খুব যোয়ান এবং কালো রং-এর হবে; আর তার মস্ত জুল্‌পী থাকবে, টাঙ্গির মত গোফও থাকবে; —এই রকম একটা আন্দাজ করে রেখেছিল সে। কিন্তু রোহিত এল। উঠানে ওর শ্বশুরের লাগানো ফজলী আমের গাছটার তলায় বাঁধানো বেদিতে বসালো তাকে অভয়। বৌটা আড়াল থেকে দেখছে।

তবে যে বলছিল ডাকাত! এ তো গত রাত্রের দেখা যাত্রার রাজকুমারের মত। তার থেকেও সুন্দর! বাবা! কি রূপ! ওরই জন্য চা-খাবার তৈরী করছে, জানতো না। জানলে সে নিশ্চয় খাবারে আর একটু গঠন বৈচিত্র করতো, সন্দেশে আরো ভালো ছাপ দিত, চায়ের জন্য আরো ভালো পেয়ালা বের করতো।

কিন্তু ওর নিজের চেহারাটা যে অত্যন্ত কুৎসিত হয়ে উঠেছে

রান্নাশালে থেকে। এখুনি তো চা দিতে যেতে হবে। মেয়েটা তাড়াতাড়ি ভিজে গামটা দিয়ে মুখ-হাত-পা মুছে নিল, ওদিকে অভয় ডাকছে,—কৈ গো, আমাদের চা-টা দাও একটু।

—বিয়ে কোথায় করলে অভয় ? কদ্দিন করেছ বিয়ে ?

—এই তো রামনগরে ! বিয়েটা হোল গিয়ে চুয়াল্লিশ সালে। পঁয়তাল্লিশ সালেই বাবা মারা গেল—তুমি তখন সরকারের ঘরে ঘরজামাই !

—বেশ বেশ ! বিয়েতে পেয়েছ কি ? সোনার ঘড়ি, চেন, সাইকেল ?

—একদম কিছু না ! ঐ বৌটাই পেয়েছি। তা বৌটা ওরা সত্যি খুব ভাল দিয়েছে ভাই রোহিত ! ওদিকে আমায় ঠকায় নি। বাবা-বেটা ও বিষয়ে খুব চালাক ছিল ; দেখে শুনে এনেছিল বৌটাকে।

রোহিত খুসী হোল বন্ধুর বৌ-ভাগ্য শুনে। আর খুসী হোল বৌটা স্বয়ং। তার স্বামী ঐ লোকটির কাছে তার প্রশংসা করছে শুনে খুসী তার হবারই কথা ! কিন্তু স্বামীর কথার মর্য্যাদা রাখতে তাকে তো আর একটু ভদ্রভাবে যেতেই হবে ওর সামনে। চট্ করে এ ঘরে এসে একখানা ফর্সা কাপড় পরে নিল সে। ওদিকে অভয় দ্বিতীয় ডাক দিল—কৈ, কোথায় গো ! চা হয় নি নাকি ? —যাই !—আস্তে উত্তর এল ভেতর থেকে।

তার পরই এলো সে ; দু'হাতে দু' থালা খাবার ; মাথায় সমান্য ঘোমটা, ঠোঁটে অপরিস্ফুট হাসিটুকু ! রোহিত অবশ্য ওকে দেখতো না, ও রকম করে কোনো মেয়েকে দেখা তার ইচ্ছার এবং

আদর্শের বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু অভয় দেখালো। নিজের হাতে বৌ-এর ঘোমটা টেনে খুলে দিয়ে বললো—দেখ ভাই!

বৌকে বললো—প্রণাম কর।

রোহিত দাঁড়িয়ে উঠে আশীর্ব্বাদ করলো ওকে। বললো, —দেশমাতৃকার যোগ্য সন্তান হও! বীর-প্রসবিত্রী হও।

এই ওদের আশীর্ব্বাদ। এর বড় আশীর্ব্বাদ করতে ওরা শেখে নি—ঐ রোহিতদের দল। ওদের দৃপ্ত যৌবন শুধু একটি মাত্র আদর্শকে লক্ষ্য করে চলেছে, 'দেশমাতৃকার যোগ্যসন্তান হতে হবে।'

চা-খাবার খেয়ে ওরা বাইরের ঘরে চলে গেল তুজনেই, বৌটা কিন্তু সেই থেকে ভাবছে, কী ঐ আশীর্ব্বাদটার অর্থ! লেখা পড়া সে সামান্যই জানে, আর এই কুড়ি বছরের জীবনে সে বহু ব্যক্তিকেই প্রণাম করেছে, আশীর্ব্বাদও পেয়েছে, "সুখে থাক, ভাল বর হোক, জন্ম এয়োস্ত্রী হও," না হয় বড় জোর "খোকা হোক" কিন্তু এ কি আশীর্ব্বাদ করে গেল? কী চাইলো সে ওর কাছে? কী হতে বললো ওকে? কার যোগ্য সন্তান?

নাঃ, ভেবে ও কিছুই ঠিক করতে পারলো না। তবু ভাবনাটা ওকে ছাড়তেই চায় না। শেষে ঠিক করলো, জলকে গিয়ে যদি রাকার সঙ্গে দেখা হয় তো জিজ্ঞাসা করবে কথাটার অর্থ। কথাটা ও মুখস্থ করে রাখলো। রাকা ওর বান্ধবী নয়, তবে ও জানে, রাকা এই গ্রামের শেরা বিদুষী!

খোকাকে কাজল পরিয়ে কোলে নিতে নিতে সত্যভামা ডাক দিল,—আয় রে রুক্ণী! কাপড় ছাড়া হোল তোর?

রুক্মিণী তখনো ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রসাধন করছে। নাকে পাউডার-পাফ্‌টা আর একবার বুলিয়ে নিতে হবে, আর ঠোঁটের রংটা বড্ড গাঢ় হয়ে গেছে, একটুখানি পাত্‌লা করে দিতে হবে। বললো,—ওয়ান মিনিট প্লিজ! দিদি!

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দরজা খুলে বেরিয়ে এল রুক্মিণী। ওরে ব্যস্! যেন উর্ব্বশী! কী সাজটাই করেছে রুক্মিণী! সত্যভামা অবাক হয়ে তাকালো বোনের দিকে। রুক্মিণী কি রাকাকে শুধু দেখতে যাচ্ছে, নাকি তাকে মুগ্ধ করতে যাচ্ছে, কিংবা তাকে জয় করতে যাচ্ছে! কিন্তু সে কিছু বললো না। তাদের বড়লোক বাপের আদুরে মেয়ে রুক্মিণী আর সত্যভামা; দিদির বাড়ীতে এসে একটু ফরসা কাপড় পরে না বেড়ালে বাপের সম্মান বাড়ে কি করে? তাই হয়তো সত্যভামা অন্য কিছু না বলে শুধু বললো—জুতোটা খুলে ফ্যাল!

—কেন! জুতো না পরে যাবো কি করে দিদি! রুক্মিণীর কণ্ঠ রুক্ষ। রুক্ষতর কণ্ঠে সত্যভামা বললো—জুতোপায়ে প্রণব চাটুজ্যের বাড়ী যাওয়া চলে না। জুতো খুলে আলতা পরে নে!

—বাব্বা! কে বাবা এই প্রণব চাটুজ্যে তোমাদের?—রুক্মিণা বিরক্ত হয়েই উঁচুহিল জুতোজোড়া খুলে চটি পায়ে দিচ্ছে, সত্যভামা বললো—চটিও চলবে না—খোল্।

—তা হলে দরকার নেই যাবার। ন্যাড়া পায়ে আমি বেরুতে পারবো না।

—বলছি তো, আলতা পরে নে!

—আলতা পরি না আমি। আলতা আমার নেইও।

—আমার ঘরে রয়েছে, আয় পরিয়ে দিই।

সত্যভামা টেনে বোনকে নিজের ঘরে ঢোকালো। চেয়ারে বসিয়ে নিজের হাতে তার পায়ে আলতা পরাচ্ছে। রুক্মিণী শুধুলো,—জুতো পরে যাবার যো নেই কেন দিদি ?

—ওখানে গেলেই বুঝতে পারবি—সারা বাড়ীটাই ঠাকুরঘর।

রুক্মিণী অপ্রসন্ন মুখে চুপ করে রইল। এত সুন্দর সাজ সে করেছে, আর পায়ে জুতো থাকবে না—এ কী অত্যাচার ! জরী দেওয়া উঁচুহিল জুতোটার মর্য্যাদা মাঠেই মারা গেল ! যতো সব !

—আলতা পরলে পা আরো সুন্দর দেখায়—বুঝলি ?

—তুমি পরো দুবেলা আলতা ; আমার ও সব পোষায় না।

সত্যভামা বোনের বিরক্তির হেতুটা ঠিকমত বুঝতে পারছেনা। এত সাজ-পোষাকেরই বা কারণ কি এই পাশের বাড়ীতে যাবার জন্য ? দিনরাত্রির যে-কোনো সময়ই তো যেকোনো বেশে ওখানে যায় সত্যভামা। আজও ওখানে যাবার জন্য সে সাধারণ একখানা ধোয়া শাড়ী মাত্র পরেছে—আর রুক্মিণী !

বর্ত্তমান বাজারে ওর শাড়ীখানার দাম তিনশ টাকার কম নয়। কিন্তু সত্যভামা এ সবে বিচলিত হোত না। টাকা তার বাপের আছে। তারা হালের বড়লোক ! তার পর যুদ্ধের বাজারে টাকা, পয়সায় একেবারে ঢাক হয়ে উঠেছে। রুক্মিণী বাড়ীর ছোট মেয়ে—তার গয়না-কাপড় সকলের থেকে বেশিই হবার কথা। কিন্তু সত্যভামা চিন্তিত হোল রুক্মিণীর অকারণ এতখানি

অসাধারণ সাজসজ্জা করা দেখে। কিন্তু খুসীই হচ্ছিল সে বোনের রূপ এবং তার পরিপাট্য প্রসাধনে, শুধু বুঝতে পারছিল না কার হৃদয় জয় করবার জন্য বোনের এই আয়োজন। রাকাদের বাড়ীতে রাকা, তার বাবা-মা এবং দাদা মন্দার আছে। কিন্তু মন্দার এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ—রুক্মিণীর সঙ্গে তাকে মোটে মানাবে না। তাছাড়া ওদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা ভাল নয়,—তথাপি সত্যভামার মনে হোল, রুক্মিণী নিশ্চয়ই মন্দারকে দেখাবার জন্যই এতখানা সাজপোষাক করেছে। বোনের পায়ে ভাল করেই আলতা পরিয়ে দিয়ে বললো—চল তাহলে!

কোনো কথা না বলেই রুক্মিণী উঠলো। খোকাকে কে কোলে নেবে? রুক্মিণীর ইচ্ছে নয় যে একটা ছেলে কোলে নিয়ে যাবে ওখানে—তা সে ছেলে যারই হোক এবং যতই সুন্দর হোক। কিন্তু তাকে কিছুই ভাবতে হলো না, সত্যভামা নিজেই কোলে নিল তার ছেলেকে।

দু'বোনে বেরুলো। নেহাৎ একটুখানি পথ—তাও গলি রাস্তা, গ্রামের কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নাই বললেই হয়। তথাপি সত্যভামা অনেকটা ঘোমটা টেনেছে।

—অত কনেবউ সাজলে কেন দিদি?—রুক্মিণী প্রশ্ন করলে।

—এখানে এইরকম নিয়ম। রাস্তায় বেরুলে ঘোমটা দিতে হয়।

—ওঃ—রুক্মিণী নিতান্ত একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করলো জিভে।

মিনিট দুই গিয়েই প্রণব চাটুজ্যের বাড়ীর দুর্গাদালানে ঢোকবার প্রকাণ্ড ফটক। ভাঙ্গা ফটক, তবু দেখবার বস্তু তাতে বিস্তর আছে, কিন্তু রুক্মিণী কিছু দেখছে না। ওর দিদি দেখাতে

চাইল, বলল,—কতকালের পুরাণো বাড়ী দেখছিস্, এখনো কেমন শক্ত আছে ? ঐ দেখ, থামের কারুকাজ, দেওয়ালের রং আর বেদীর সূক্ষ্ম শিল্প দেখ !

—হুঁ—রুক্মিণী এগিয়ে চললো।

—এদের বংশেরই একজন পলাশীর যুদ্ধের সময় বীরের মত মরেছিলেন। ঐ যে স্তূপটা দেখছিস্—ওখানে তাঁর অস্থি আছে—শুনেছিস্ !

—ওঃ—রুক্মিণী অন্যমনস্ক ভাবেই বললো।

সত্যভামা বুঝতে পারলো, বোনের মনটা এখন ইতিহাসের পাঠ নেবার জন্য প্রস্তুত নয়, তাই চুপ করে গেল সেও। দরজার পরে দরজা পার হয়ে চকমিলান উঠানে এসে পড়লো ওরা। ইট-কাঠ-ভাঙা স্তূপ চারিদিকে, মাঝে মানুষ চলা সরু রাস্তা। তারপর আবার দরজা গোটাতিনেক, তারপর অন্তঃপুর। উঃ এমন আব্রুর মধ্যে মানুষ থাকে কি করে ? যেন জেলখানা। রুক্মিণীর অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ঘরগুলোয় কিরকম গুমোট গন্ধ একটা—অন্ধকার। কিন্তু রুক্মিণীকে যেতেই হবে, দেখতেই হবে, কালরাত্রের দেখা সেই মেয়েটাকে যে মেয়ে রোহিতের সঙ্গে কথা বলেছিল। ওকে দেখে রুক্মিণীর কি পরমার্থ লাভ হবে, সে নিজেই জানে না—কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের মন। কখন যে রুক্মিণীর অজ্ঞাত মন রাকাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভেবে নিয়েছে—জানে না রুক্মিণী।

—ওমা। কে গো ; আমার মা যে—এক আশ্চর্য্য রূপবতী মহিলা বেরিয়ে এলেন ওদের অভ্যর্থনা করতে। তাঁর পিছনে

আর একজন, যেন দুর্গার পিছনে লক্ষ্মী! ইনি নিশ্চয় রাকার মা; রুক্মিণী অনুমান করছে।

—এসো দাদা আমার!—উনি সত্যভামার কোল থেকে খোকাকে নিলেন।

এতক্ষণে রুক্মিণী দেখতে পেল রাকাকে পরিপূর্ণ ভাবে। কালোপাড় একখানি সাদা খদ্দরের শাড়ী, খদ্দরের ব্লাউস—মনিবন্ধে দুগাছি করে সাধারণ চুড়ি—মাথার চুলগুলো এলো খোপায় বাঁধা—তাতে গোঁজা একগুচ্ছ আশোক ফুল—এই রাকা!

ম্লান হয়ে গেল রুক্মিণীর সমস্ত প্রসাধন-গৌরব। স্নো, ক্রীম, পাউডার, শাড়ী, জরী, সোনা, হীরা, মোতি, চুনীর এমন নির্ম্মম পরাজয়ের কথা রুক্মিণার জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম! রাকাকে দেখে ওর মনে হতে লাগলো—ঈশ্বর স্বয়ং যাকে রূপের তুলিতে সাজিয়েছেন, তার সজ্জার জন্য মার্জ্জিত রুচি ছাড়া আর কিছুই লাগে না! শুধু তাই নয়, অন্য কিছু দিয়ে তাকে সাজাতে যাওয়া নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা। এই কঠোর সত্যটা রুক্মিণী আর কখনো এমন করে অনুভব করেনি! ওর লজ্জা করছে নিজের বহুমূল্য অলঙ্কারগুলোর পানে তাকিয়ে। কিন্তু রাকাই কাছে এল। হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো, যেন কতকালের পরিচিতা বান্ধবী। বললো—আসুন! আমারই যাওয়া উচিৎ ছিল আপনাকে দেখতে, সময় করতে পারিনি!

সত্যভামা প্রণাম করলো রাকার মাকে। উঠে বললো, —প্রণাম কর রুক্মিণী!

রুক্মিণী প্রণাম করলো। তারপর রাকার হাত ধরে উঠলো

গিয়ে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের সেই অশোক গাছটার কাছে। রাকা বড় একটা অশোকগুচ্ছ তুলে ওর কবরীতে গুঁজে দিতে দিতে বললো,—আপনার সঙ্গে আমার প্রীতিবন্ধন এই অশোকের মতন সুন্দর হোক!

—এমনি লাল! লাল রং কিন্তু ভাই রক্তের চিহ্ন; যুদ্ধের চিহ্ন ওটা!

রুক্মিণীর অবচেতন মনের প্রকাশ বুঝি কথাটায় রূপ গ্রহণ করছে—রুক্মিণী যেন যুদ্ধই করতে এসেছে রাকার সঙ্গে। কিন্তু রাকা হেসে বলল,—না—লাল রং যৌবনের প্রতীক! বসন্ত ঋতু বৎসর-রাজের পূর্ণ যৌবনকাল, তাই দেখুন না, বসন্তের ফুল সবই লাল হয়—আশোক, কিংশুক, শাল্মলী সবই লাল, আর যৌবনের ধর্ম্ম হচ্ছে একতা, অই দেখুন না, ওরা সব সব গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে ফোটে—ওরা যেন বলে, যৌবন, একত্রিত হও, মিলিত হও—পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে, নারীতে পুরুষে একত্রিত হও—মিলনের এমন মধুমাস বৎসরের মধ্যে আর নাই।

রাকা হাসিমুখে বলে গেল কথাগুলি। রুক্মিণীর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনেক-কিছু শিক্ষা দিয়েছে। বিদ্যার অহঙ্কার তার যথেষ্ট। কিন্তু আজ লাল রংকে যুদ্ধের চিহ্ন বলে সে কি এই পল্লীবালার কাছে হেরে যাবে? কিন্তু রাকার কথার প্রতিবাদ করবার মত কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছে না রুক্মিণী। কথাটা চাপা দেবার জন্য সে বললো,

—বেশ, আমাদের মিলন অশোকের মতই লাল হোক, আমি

স্বীকার করছি, শুধু লাল নয়, এমনি একবৃন্তে ফোটার মত সুন্দর আর মহিমাময় হোক।

—গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে উঠুক বাংলার,—ভারতের যৌবন-শোণিত। মিলনের মহামন্ত্র উচ্চারিত হোক ফাল্গুনের ফাগ-উৎসবের অশোক-মন্ত্রে।

—তারপর?—রুক্মিণী হেসেই প্রশ্নটা করলো, কিন্তু অন্তরটা ওর যেন জ্বালা করছে। এমন করে কথা বলা ওর অভ্যাস নাই।

—তারপর? তারপর ঋষি বলেছেন—

"সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ—চরৈবেতি। চরৈবেতি" তারপর এগিয়ে যেতে হবে—এগিয়ে যেতে হবে অশোক-মন্ত্র—অভয়মন্ত্র নিয়ে অমৃতের পথে—যৌবনের জয়যাত্রার পথে।

—তারপর?—রুক্মিণী যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ!

—তারপর বর্ষার রাখীবন্ধনের উৎসব হবে, মিলনকে মৈত্রীতে দৃঢ় করা হবে। জলে স্থলে একাকার হয়ে যাবে পৃথিবী—আর সেই মেঘ-মল্লারের সুরে সুর মিলিয়ে আমরা গাইব চল্লিশ কোটি ভারতবাসী :—

আজি এসেছো ভুবন ভরিয়া—

গগনে ছড়ায়ে এলোচুল, চরণে জড়ায়ে বন ফুল...

কী চমৎকার ভঙ্গীতে বলে মেয়েটা! রুক্মিণী অবাক হয়ে শুনছে। কিন্তু রাকা কথা বন্ধ করে দিলে অকস্মাৎ। কথা ও হয়তো আর বলতে চাইবে না—কারণ ওর ভাবুক চিত্তে যেন কিসের স্পর্শ লেগেছে। রুক্মিণী ওকে চুপ করতে দেখে বলে উঠলো,

—বেশ গলা তো আপনার! গান গাইতে পারেন?

—গান? এখন সময় কৈ? আসুন, বাবার কাছে যাই।

রাকা ওর হাত ধরে টানলো। রুক্মিণীরও ইচ্ছে রয়েছে এই মেয়েটির বাবাকে দেখবার। সে গেল উঠে মন্দিরের ভেতর। মস্ত বড় ঘর; আলো-আঁধারের মধ্যে কাঠের প্রকাণ্ড সিংহাসনখানা দেখলো রুক্মিণী। কি একটা অদ্ভুত সুগন্ধ ওর নাসারন্ধ্রে ঢুকে প্রাণ-মন এক স্বর্গীয় ভাবে আচ্ছন্ন করে তুললো। রুক্মিণী দাঁড়িয়ে গেল সিংহাসনটার সামনে। কী অপূর্ব্ব কারুকার্য্য এই কাঠের উপর!—কী বিশাল এর আয়তন! কী রোমাঞ্চকর এই অনুভূতি! রুক্মিণী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম না করে পারলো না।

ওদিকের দরজা দিয়ে ছোট্ট একটু বারান্দায় নিয়ে গেল তাকে রাকা। অসংখ্য পুঁথি পত্রের মাঝখানে বসে আছেন প্রণব চাটুজ্যে। যেন শ্বেতশুভ্র মহেশ্বরের জীবন্ত মূর্ত্তি। রুক্মিণী কিভাবে ওঁকে প্রণাম করবে তাই ভাবছে। রাকা ওর পরিচয় দিয়ে বললো,

—উনি বি, এ, পরীক্ষা দেবেন এবার!

রুক্মিণী এর মধ্যে নিজকে সামলে প্রণাম করছে। প্রণব চাটুজ্যের সহাস্য আনন থেকে প্রসন্ন আশীর্ব্বাণী ঝঙ্কৃত হোল,—

—চিরায়ুষ্মতী হও! বসো মা, বসো!

রুক্মিণী কোনো কথা না বলে বসে পড়লো প্রকাণ্ড আসনের একধারে। ওর মনে হচ্ছে, প্রাচীন যুগের কোনো ঋষির আশ্রমে সে পাঠ নিতে এসেছে। গুরু যেন কৃপা করে তাকে বসবার অনুমতি দিলেন।

কলকাতার বিস্তর অভিজাত পরিবারে গতায়াত আছে রুক্মিণীর কিন্তু সেখানকার বায়ুমণ্ডল আর এখানকার বায়ুমণ্ডল

যেন এক পৃথিবীর নয়। এ যেন অপর একটি রাজ্য। শ' পাঁচেক গজ দূরে খিড়কী পুকুরের কিছুটা দেখা যাচ্ছে; বাঁধানো ঘাটের ভাঙা সিড়িগুলোও। ওরই একদিকে বিশাল একটা তমাল গাছ সহস্র বাহু মেলে স্থানটিকে যেন যোগীর আশ্রমের মত করে রেখেছে। প্রণব চাটুজ্যে সেইদিকে চেয়ে বললেন,

—ঐযে বড় গাছটা দেখছো মা, ওটা কি গাছ, চেন?

—না—রুক্মিণী ধীর মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল!

—ওর নাম তমাল। কলকাতা বা পূর্ব্ববঙ্গে ও গাছ বেশী নাই।

—হ্যাঁ—আমি আগে কখনো দেখিনি ও গাছ!

—এই ফাল্গুনে ওর পুরোনো পাতা ঝরে নতুন পাতা গজিয়েছে, দেখছো?

—হ্যাঁ!—জবাব দিল রুক্মিণী, কিন্তু ভালো লাগছে না। এতবড় একজন বিরাট মানুষ, তার কাছে কি রুক্মিণী শুধু তমাল গাছের পাতা-ঝরার কাহিনী শুনতে এসেছে নাকি? ও নিরাশ হচ্ছে ক্রমশঃ। ইনি নিশ্চয় বেদ-উপনিষদ নিয়ে কথা বলবেন, এই আশাই করছিল রুক্মিণী।

—ঐ গাছটা আমার এক পূর্ব্বপুরুষ পুঁতেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

—ওঃ!—রুক্মিণী নিরস কণ্ঠে সাড়া দিল।

—আর পলাশীর যুদ্ধে দেশ পরাধীন হয়।

—হ্যাঁ!

—তারপর থেকে ঐ গাছটা প্রতি ফাল্গুনে নতুন সাজ করে'

সারা বছর অপেক্ষা করে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্যের উদয় দেখবার জন্য !

রুক্মিণী চুপ করে রইল। প্রণব চাটুজ্যের চোখে সীমাহীন জ্যোতিঃ—ওর পাতাগুলো দেখ মা—শ্যামল, সবুজ, তরুণ, কিন্তু কাণ্ডটা কালো হয়ে গেছে গভীর বেদনায়—প্রণব চাটুজ্যের কণ্ঠে যেন ক্রন্দন।

রুক্মিণী কোনো জবাব দিতে পারলো না।

উনি বলছেন—ওর কাণ্ডটার ভেতরের কাঠের রং তুমি দেখে এসো মা—লাল—আগুনের মত লাল, সে রং যেন জ্বলছে !

প্রণব চাটুজ্যের চোখও জ্বলছে। রুক্মিণী নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলো।

—ও ভারতের স্বাধীন মৃত্তিকার রস পান করেছে—ও ভারতের স্বাধীন মৃত্তিকাতেই মরতে চায়—তাই প্রতি বৎসর ওর নবযৌবন জাগ্রত হয়। ও আমার সেই পূর্ব্ব পুরুষ—ও আমাদেরকে সৃষ্টি করছে প্রতিবৎসর নব যৌবনের অগ্নিতে ! ওকে প্রণাম করে এসো।

রুক্মিণী যেন সে রুক্মিণী নয়। ধীরে সে উঠে একাই চলে গেল তমাল গাছটার কাছে। আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলো, তারপর দেখলো সেই সুবিশাল মহীরুহকে। সুকৃষ্ণ কাণ্ডটার কোনো কোনো যায়গা ফেটে গেছে, আর তার ভেতর দেখা যাচ্ছে আগুনের মত লাল রং—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার বেদনার বহ্নিমান শিখা—যৌবনের জাগ্রত বৈজয়ন্তী !

রুক্মিণী আবার প্রণাম করলো হাত যোড় করে। সে প্রণাম-

নিবেদনের মধ্যে এতটুকু আবিলতা নেই, এক বিন্দু অবিশ্বাস নেই! আশ্চর্য্য! কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, ক্লাসের ছাত্রী রুক্মিণী—যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রণামের ব্যবস্থা প্রায় নির্ব্বাসিত হয়েছে—সেই রুক্মিণী প্রণাম করলো একটা গাছকে! কিন্তু করলো—জাতীয়তাবোধের গৌরবে নয়, পরাধীনতার জ্বালায় নয়—প্রণাম করলো একটা আশ্চর্য্য অনুভূতিতে, যে অনুভূতি ওর জীবনে এই প্রথম; যার ব্যাখ্যা করতে ওর সময় লাগবে জীবনভোর। জীবন দিয়ে যার ব্যাখ্যা করতে হয়, এমনই সে অনুভূতি। ওর মনে হোল, শ্যামল পত্রজটা সমাবৃত এই বীর তরু-সন্ন্যাসী যেন চাইছেন নব যৌবনের উষ্ণ রক্ত, যে রক্ত জন্মভূমির পরাধীন মৃত্তিকার কলঙ্ককালি ধুয়ে দেবে—মুক্ত করবে কৃষ্ণ শৃঙ্খল। নিজেকে ওর আজ, এই মুহূর্ত্তেই যেন সর্ব্বরিক্তা সন্ন্যাসিনীর মত মনে হোল। মনে হোল—ওদের সব গেছে, ওরা সর্ব্বহারার সন্তান—ওদের আবার সাজ পোষাক কি? ওদের আবার আভিজাত্য কোথায়? ওরা এখনো মানুষ আছে নাকি?

নিজের মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারকে ওর এত তুচ্ছ কখনো মনে হয় নি। কিন্তু এ অনুভূতি হয়তো নিতান্ত সাময়িক, হয়তো পর মুহূর্ত্তেই জুড়িয়ে যাবে এ অনুভূতি, কিন্তু এই অনুভূতি আছে—রুক্মিণীর মত মেয়ের মধ্যেও আছে। পরাধীন জাতির জাতীয় জীবনে এই অনুভূতি ওতঃপ্রোতঃ—তফাৎ শুধু কারো সক্রিয় মনের জাগরণে আর কারোবা এখনো নিষ্ক্রিয়তায় ছায়াচ্ছন্ন।

রুক্মিণী ফিরে এলো। প্রণব চাটুজ্যের সস্মিত দৃষ্টি ওর

পানে। হাসি রুক্মিণী অনেক রকম দেখেছে, কিন্তু চোখের হাসি আজ প্রথম দেখলো। ঘন কালো ভ্রূর তলায় কৃষ্ণতার উজ্জ্বল চোখ থেকে কি এক অপার্থিব হাসি ঝিলিক্ মারছে যেন। চোখের হাসি এত সুন্দর হয়—জানতো না রুক্মিণী।

—বসো মা—উনি স্নেহের সুরে বললেন—তোমাকে দেখে খুব খুসী হলাম।

—আমি দেশমাতার জন্য কিছুই এ পর্য্যন্ত করিনি—রুক্মিণীর কণ্ঠস্বর কুণ্ঠায় যেন নিখাদে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু প্রণব চাটুজ্যে ওকে অবসর দিলেন না, বললেন,—তুমি যে কিছুই করনি—এই জ্ঞানটুকু থাকলেই এখন যথেষ্ট হবে মা, তোমার সারাটা জীবন করবার জন্য পড়ে আছে। তাই বলছিলাম, অনুভূতিকে জাগ্রত করাই সর্ব্বপ্রধান কাজ! সর্ব্ব প্রথম কাজ!

রুক্মিণী চেয়ে রইল ওঁর মুখের পানে। উনি একটু থেমে বললেন—এই দেশের মানুষগুলো আজ জীবধর্ম্মেই দীক্ষিত হচ্ছে। মানুষের ধর্ম্মকে তারা খাটো করে দেখতে দেখতে একেবারে ভুলে এসেছে আজ! পশ্চিমের উগ্র সভ্যতা, উজ্জ্বল জীবন-প্রবাহ প্রাচ্যকে বড় বেশি অভিভূত করেছে এই দুই-শতাব্দি ধরে; কিন্তু মা, ও-জীবন শুধু জৈবিক জীবন; ওর অন্তঃসারশূন্যতা আজ ধরা পড়েছে অনেকের চোখে—তাই আবার প্রাচ্যের মানুষ তার সুশীতল অনুগ্র মানব-সভ্যতায় ফিরে যেতে চায়—কিন্তু মা…

উনি থামলেন। রুক্মিণী ওঁর মুখের পানে চেয়ে রইল কি উনি বলবেন, শুনবার জন্য। প্রায় মিনিট খানেক থেমে থেকে উনি

বললেন,—মানুষের ধর্ম্মবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে। আচারে অনুষ্ঠানে যে ধর্ম্ম আশ্রিত, আমি সে-ধর্ম্মের কথা বলছি না, বলছি মানব ধর্ম্মের কথা। যে মানব-ধর্ম্ম অসত্যকে ঘৃনা করে, অত্যাচারকে তিরস্কার করে, অন্যায়কে প্রতিবাদ করে ন্যায়ের দ্বারা, আমি সেই ধর্ম্মের কথাই বলছি।

রুক্মিণী কোনো কথা বলতে সাহস পেল না। চুপটি করে বসে রইল। উনিই বলতে লাগলেন,

—দীর্ঘকাল ধরে অন্যায় সয়ে সয়ে আমরা অন্যায়টাকেই ন্যায় বলে মনে করতে শিখেছিলাম। পরাধীনতার বেদনাতে কড়া পড়ে গিয়ে কিছুদিন যেন ব্যথাবোধ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল আমাদের, কিন্তু ঐ কড়াটা আজ পেকে উঠেছে, তাই যন্ত্রনাও আজ অসহ্য! তাই প্রতিমানুষের কণ্ঠে, কাণে, প্রাণে, অনুভূতিতে এই একই বেদনার হাহাকার; কিন্তু হায় হায় করলেই যথেষ্ট হোল না মা—এর প্রতিকার চাই! আর সে প্রতিকারের ওষুদ রয়েছে তোমাদেরই যৌবন-শক্তিতে। সেই অমোঘ অমৃত-ওষধিকে অকারণ বিলাসে, অহেতুক উচ্ছ্বাসে ব্যয় করো না। জীবনটাকে মানুষের জীবনের মতই ব্যয় করো—এই আমার উপদেশ!

ওঁর কথাগুলোতে সুগভীর বেদনাময় গানের সুরের মূর্চ্ছনা যেন। রুক্মিণী অনেক স্বদেশীসেবকের বড় বড় বক্তৃতা শুনেছে—অনেক হাততালীও দিয়েছে। কিন্তু সভার বাইরে এসেই ভুলে গেছে সবই। কিন্তু আজ এই প্রৌঢ় লোকটির প্রতিকথা ওর অন্তরে গেঁথে গেল যেন। অনেক জিজ্ঞাসা ওর মনে জেগে

উঠলো কিন্তু রাকার মা ডাকলেন ঠিক সেই সময়েই—এসো মা, প্রসাদ নেবে।

—যাও—প্রসাদ নাও গিয়ে।—উনিও বললেন।

রুক্মিণী আর একবার প্রণাম করে উঠে গেল, বলে গেল, —কাল আমি আবার আসবো আপনার কাছে।

—যখন খুসী এসো মা।

প্রসাদ নিয়ে রুক্মিণী দিদির সঙ্গে বাড়ী ফিরছে—সত্যভামা প্রশ্ন করলো—কেমন লাগলো রে রাকাদের বাড়ী—ওর বাবা আর মাকে ?

জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে রুক্মিণী বললো—

—পলাশী এখান থেকে কতদূর দিদি ?

—কাছেই—সত্যভামা অবাক হয়ে উত্তর দিল।

—আমি দেখতে যাব—ব্যবস্থা করে দাও।

—তোর জামাই বাবুকে বলিস, কিন্তু ওখানে তো শুধু মাঠ।

—তা হোক, আমি যাব।

ওরা লাইব্রেরীর খাতাপত্র নিয়ে বিস্তর কথা কাটাকাটি করলো ; অভয়ের বউ আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল—মাঝে মাঝে ওর মনে হচ্ছিল, এই বুঝি হাতাহাতি হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ যে লোকটি, রোহিতাশ্ব নাকি নাম, কেমন সুন্দর উপায়ে প্রত্যেক-বারই থামিয়ে দিল ওদের ঝগড়ার প্রবৃত্তিকে। ওর কথা বলার ভঙ্গীই আলাদা ; অথচ ও তো এই গাঁয়েরই ছেলে। কোথায়

শিখলো এত সব!—ভাবছিল; হঠাৎ ওদের তর্ক থেমে হাসি উঠলো। অভয় ঠিক সেই সময় হেঁকে বললো বউকে—ষোলো কাপ চা করে দাও!

বাব্বা! ষোল কাপ চা! বৌটার বিরক্তি বোধ হচ্ছে। এর মধ্যে যদি আরো পাঁচজন এসে জোটে তো বিশ কাপের অর্ডার হবে, যত ঝামেলা ওর ঘাড়ে! কিন্তু চা করতেই হবে, জানা আছে ওর। তাই উনুনে জলও চাপিয়ে রেখেছে অনেকটা! কিন্তু ঐ ফর্সামত ছেলেটি কি যেন বলছে; সেটা না শুনে ও রান্নাঘরে যেতে পারে না!

—"এখন দলাদলি করে ঝগড়া-বিবাদ করবার সময় নয়। দলাদলি বিস্তর আমরা করেছি, আর তার ফলও ভালরকম ভাবেই ভোগ করছি; ভাতকাপড়ের অভাব থেকে রক্তারক্তি, খুনোখুনি পর্য্যন্ত হয়ে গেল এই দলাদলির জন্যই। কিন্তু আর নয়, ভাই সব, এবার মিলনের দিনকে ফিরিয়ে আনো। যা গেছে তা যাক, যা আছে, তাকে রক্ষা করবার জন্য সকলে একযোগে আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের বিস্তর গেছে, তবু বিস্তর আছে এখনো। এখনো আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, পূর্ব্ব পুরুষের বিরাট স্মৃতি আছে। আমাদের নৈতিক চৈতন্য জাগ্রত আছে—আছে আমাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, মনে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প...."

—চা করছো গো? দাও শিগ্রী! গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, রোহিতের!

হাঁক দিল আবার অভয়। রোহিতের বক্তৃতাটা বিকৃত করবার জন্যই হাঁক দিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি করছে হয়তো। বউটা

অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছে। রোহিতের বক্তৃতার প্রায় কিছুই ও বোঝে না—তবু ভাল লেগেছে ওর। এই সময় চায়ের জন্য তাগাদা দেওয়া—লোকটা যেন কী ; জানোয়ার !

নিজের মনেই বলতে বলতে চা করতে গেল সে। মানুষের স্বামীভাগ্য কত সুন্দর হয়। ওরও স্বামীভাগ্য খুব ভাল বলেই জানে গ্রামের লোক—শুধু ও নিজেই জানে না। ওর স্বামীভাগ্য নিয়ে ও কোনদিন আলোচনাও করেছে কি না, কে জানে ? কিন্তু আজ ওর অপ্রসন্নতা যেন পরিস্ফুট হচ্ছে।

এর মধ্যে কত কি কথা হয়ে গেল বাইরের ঘরে—ও জানতে পারলো না। চা তৈরী করে এদিকে এসে হাতের চুড়ি বাজিয়ে জানাতে চাইল—চা তৈরী। কিন্তু ওরা আবার হট্টগোল করছে। ওর চুড়ীর ক্ষীণ শব্দ কানেই যাচ্ছে না কারু। হঠাৎ সেই ছেঁলেটিই বললো—দেখ অভয়, চা হয়েছে বোধ হচ্ছে।

ও ঠিক শুনতে পেয়েছে। ওর কাণের সূক্ষ্মতাকে প্রসংসা করবার সময় পেল না বউটা। রান্নাঘরে গিয়ে চা ঢেলে দিল বাটিতে। অভয় নিজেই নিয়ে এল ; পরিবেশন করলো সকলকে। রোহিত আর খেল না, বললো—বাড়ীতে খেয়েছে, আবার এখানে খেয়েছে—আর না।

লাইব্রেরীটাকে পুনর্গঠন করবার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। তার সঙ্গে রোহিতকে অভিনন্দন দেবার কথাও উঠেছিল, কিন্তু রোহিত বললো, অভিনন্দন নেবার মত কোনো কাজ সে করে নি। সে তার শিক্ষাগুরুর আদর্শের বিরুদ্ধেই কাজ করেছে—তার জন্য

অনুশোচনার অন্ত নেই তার। এখন আবার অভিনন্দন নেবে কোন্ লজ্জায় ?

কিন্তু কাজটা এদের অনেকেই সমর্থন করে। ওরা বললো, —দেশের যুবশক্তি সেদিন প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল, আর তোমরা ছিলে সেই মত্ত সৈনিকদের পুরোভাগে। তোমরা বীর, তোমাদের অভিনন্দিত করা আমাদের কর্ত্তব্য।

—না! আমরা ঘাতকের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলাম। গুপ্তাঘাত সব সময়ই নিন্দার্হ, উদ্দেশ্য তার যতই মহৎ হোক। তাই ভারতীয় ধর্ম্মে আমরা ঘাতক পর্য্যায়ভুক্ত। সম্মুখযুদ্ধ করবার শক্তি যার নেই—সে কাপুরুষ।

—কিন্তু যুদ্ধের নীতি বর্ত্তমান যুগে বদলে গেছে রোহিতদা!

—তা হতে পারে, কিন্তু মানুষের নীতি এতোটুকু বদলায় নি; আমরা মানুষ, ভারতের মানুষ, যে মানুষ আগামী শত-শতাব্দির পৃথিবীর মানুষকে মানবতায় দীক্ষা দেবে।

—আমরা তো পরাধীন—আমাদের যোগ্যতা কোথায়?

—পরাধীনতার বেদনাই যোগ্য করে তুলছে—আমাদেরকে। এই ব্যথাবোধই আমাদের জীবনকে জ্বলন্ত রাখবে মনুষ্যত্বে। আমরা বুঝি, পরাধীন জাতির জীবন কী অসহনীয়—মানুষের জীবনে পরাধীনতা কত বড় অভিশাপ—তাই এসিয়ার সমস্ত পরাধীন জাতিগুলির উপর আমাদের এত সহানুভূতি। আমরা চাই, জগতে পরাধীন যেন কেউ না থাকে। আমাদের এই মঙ্গলেচ্ছাই একদিন পৃথিবীতে শান্তি-সম্মেলন ঘটাবে। ত্রিশক্তি সম্মেলনের চুক্তিতে নয়, এটোম বোমের বিভীষিকায় নয়, লোহা,

তৈল, কয়লার অবাধ বানিজ্যনীতির সুবিধায় নয়,—মানুষের জগতে শান্তি আসবে মানবতার মৈত্রী বন্ধনে। আমরা সেই রাখিবন্ধনকে ত্বরান্বিত করবো।

—তা হলে তোমাদের কৃত ঐ কাজটাকে তুমি সমর্থন কর না?

—না। ওটা ভুল, তা ওর ব্যর্থতাতেই প্রমাণিত হয়েছে। আর ভুলকে সমর্থন করা নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া কি আর!

এর পর ওর অভিনন্দন সম্বন্ধে কথা শেষ হয়ে গেল কিন্তু লাইব্রেরীটাকে আবার চাগিয়ে তুলতে হবে। তার জন্য কঠোর পরিশ্রম দরকার হবে ওদের। তা হোক, ওরা সকলেই সম্মত আছে পরিশ্রম করতে। শুধু অভয় বললো, আমার কনট্রোল কারবার ছেড়ে আমি তো বেরুতে পারবো না।

—তোমাকে বেরুতে হবে না। চাঁদাপত্র আদায়ের কাজ আমরাই করবো; তুমি শুধু দেখবে যে বইগুলো ঠিকমত ইস্যু হচ্ছে আর রিটার্ণ হচ্ছে।

—তাছাড়া তোমার সেক্রেটারীর কাজ, চিঠি পত্র লেখালেখি, বই সিলেকশন, কমিটির মিটিং ডাকা…এগুলো তো করতে হবে!

—হ্যাঁ—সে তো হবেই!—অভয় বললো—কিন্তু রোহিত, একটা মুস্কিল কি জানো! কন্‌ট্রোলের ব্যাপারে প্রায়ই ইন্‌সপেকটার ইত্যাদি আসে—তাদের ঝামেলা মেটাতে বড্ড সময় যায়। তাই আমি বলেছিলাম যে…

কথাটা ও শেষ করলো না। থেমে গেল। ও কি

সেক্রেটারীর পদত্যাগ করতে চায় নাকি! সকলেই তাকালো ওর মুখ প্যানে।

—কি বলছিলে!—রোহিতই প্রশ্ন করলো।

—তুমি আমাকে দিনকতক একটু সাহায্য কর। মিটিংএর এজেণ্ডা করা, রিজলিউসন লেখা, চিঠিপত্র ড্রাফ্ট্ করা…এগুলো তুমি একটু করে দিলে ভাল হয়।

—তাহলে তো রোহিতদাই সেক্রেটারী হতে পারে—কে একজন প্রতিবাদের সুরে বলল।

—বেশ, আমি সাহায্য করবো—রোহিত থামিয়ে দিল সকলকে। বললো,

—সাহায্য আমি অবশ্যই করবো। কিন্তু তুমি যে শুধু কণ্ট্রোলের দোকানের মুনাফা খেয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াবে, তা হবে না। তোমাকেও আসতে হবে আমার সঙ্গে!

—হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই।—অভয় বললো! সেক্রেটারীর পদ সে ছাড়তে চায় না; কিন্তু সেক্রেটারী হবার যোগ্যতা ওর কিছুই নাই—তাই রেহিতকে সঙ্গে নিতে চায়—এ সত্য জানে সকলেই কিন্তু এখন ওর সময় ভাল, দু পয়সা হাতে আসছে আর ঘরখানাও দিয়েছে লাইব্রেরীর জন্য, তাই কেউ কিছু বললো না।

—আমি সকালে কিম্বা সন্ধ্যায় একবার করে রোজ আসবো। রোহিত জানালো অভয়কে। অভয় আস্বস্ত হোল, আর আশ্বস্ত হোল ওর বৌ। কেন হোল, ও জানে না। হয়তো তার মনে আশা জাগছিল, ঐ সুন্দর লোকটির উপস্থিতি তাকে স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে। কিম্বা সে হয়তো

আশা করছিল,—ঐ লোকটির নিকট-সান্নিধ্যে এসে সে কোনো একদিন জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে নেমে যেতে পারবে। কিন্তু জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্র কি, তা ওর জানা নেই। ঐ ছেলেটিই হয়তো জানিয়ে দেবে তাকে একদিন সেই পরম সত্য কথাটা।

এদের সভা ভঙ্গ হয়ে গেল। সকলেই চলে গেল বাইরে। সন্ধ্যা হয়েছে। দোলের যাত্রা আজও হবে তাই সবাই বাড়ী চলে গেল; কিছু খেয়ে যাত্রা শুনতে হবে রাত জেগে! অভয়ও ভেতরে এসে বললো—রান্না করেছ?

—না! এই তো চা শেষ করলাম!

—চট্ করে লুচি ভেজে দাও খানকতক। যাত্রা শুনতে যেতে হবে!

—আমিও যাব আজ!

—বাঃ, ঘরদোর দেখবে কে?

—একা আমি মেয়ে মানুষ, ঘরদোর আগলাব নাকি?

বউটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। অভয়ের মনটা প্রসন্ন ছিল সেক্রেটারীর পদ কায়েম হওয়ার জন্য, তাই রাগ না করে বললো, —বেশ যেও; আমি মাঝে মাঝে এসে ঘর দেখে যাব।

বউটা গিয়ে লুচি ভাজতে বসলো।

কাজের ঝঞ্ঝাটে ও আজ নাইতেই যেতে পেল না, রাকার সঙ্গে দেখা হবে কি করে? সেই কথাটার মানে বুঝে না নিলে ওর যেন অস্বস্তি লাগছে। অমন সুন্দর আশীর্ব্বাদ, কিন্তু কী ওর মানে? হঠাৎ ওর মনে হোল, ঐ ছেলেটি বলে গেল, সে রোজই এখানে আসবে। তাকেই তো শুধুনো যেতে পারে।

মানেটা। কিন্তু অতটা সাহস এবং নির্লজ্জতা প্রকাশ করা তার পক্ষে উচিৎ হবে কি?

লুচি ভাজতে ভাজতে ও ভাবতে লাগলো। একা ঘরে মানুষের ভাবনাটা যেন কিছু বেশি হয়। ছেলেপিলে একটা থাকলে হয়তো তাদের ঝামেলায় ও ভুলে যেত রোহিতের আশীর্ব্বাদের কথাটা। স্বামীর জন্য কাজ করাটা ওর সাধারণ গৃহিনী-মনের ব্যঞ্জনা মাত্র—কিন্তু ওর অন্তরস্থ অবচেতন মন ফাঁকা ছিল, সেখানে যেন আজ একটি বাণী জাগ্রত হয়ে উঠেছে …ও তাকে লালন করছে নিজের অজ্ঞাতসারেই। বাণীটি যেন একটি নবজাগ্রত অঙ্কুর। বিষবৃক্ষের কি অমৃত বৃক্ষের অঙ্কুর,—কে জানে? তবু ও আশা করছে অঙ্কুরটি ফুলে ফলে বিকশিত হলে অমৃতই হবে।

—কৈ গো, খাবার হোল?

অভয় এসে তাগাদা মারলো! লুচির থালাটা নিঃশব্দে এগিয়ে দিল বৌ—তার সঙ্গে মাছের ঝোল, ডিমের মামলেট, সন্দেশ, দুধ। অভয় গোগ্রাসে গিলতে লাগলো! বেশ খেতে পারে অভয়। ওর খাওয়া তারিফ করবার মত। একটা কুটোও পড়ে থাকবে না পাতে; চেটেপুটে সবশুদ্ধু খেয়ে ঢেকুর তুলে উঠে যাওয়া ওর অভ্যাস। রোজগার করে—খায়। কারো কিছু বলবার নেই, কিন্তু বৌটার মনে হোল,—এত বেশি ওর খাওয়া উচিৎ নয়। পাশের বাড়ার করবীদের আজ রান্নাই হয়নি চালের অভাবে, আর ওর চাড়ীতে এই এত খাদ্য! কতলোক না খেয়ে রয়েছে আর ওর স্বামী একা তিনজনের

খাবার খায়। থাক্‌, কিন্তু এত বেশী খাবার মত কি ভাল কাজটা ও করে? কি করে জানা আছে। আট আনার চিনি তিন টাকায় ব্যাচে, দু'আনার কেরাসীন তেল ব্যাচে দেড় টাকায় —তিন আনার ময়দা আঠারো আনায়, আড়াই টাকার কাপড় কুড়ি টাকায়! এগুলো চুরি, কি জোচ্চুরী, কি সাধুতা, তা জানতে ওর মত সাধারণ মেয়েমানুষেরও আটকায় না! কিন্তু কী হবে ওসব ভেবে। যাক্‌গে—!

অভয় চলে গেল যাত্রা শুনতে, যাবার সময় বলে গেল, —ঘরে ডবল তালা দিয়ে যেও; আমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখে যাব এসে!

স্বামী যাওয়ার পর ওর ফুরসুৎ হোল। কূয়োর জল তুলে গা ধুলো এতক্ষণে। তারপর কাপড় ছেড়ে খেয়ে নিল। এবার ঘরে তালা দিয়ে যাত্রা শুনতে যাবে। ওবাড়ীর করবীকে ডাকলে হয়—একসঙ্গে যাওয়া যেত, কিন্তু করবীদের আজ হয়তো রান্নাই হয় নি! সকালে করবীর মা একসের চাল ধার চেয়েছিল, অভয় দেয় নি, বলেছিল—নিত্যি ধার দেয় কে বাপু! পারবো না!—নাঃ, করবীকে ডাকা বড্ড নিলজ্জতা হবে আজ। একা কিন্তু যাত্রার মণ্ডপ পর্য্যন্ত যেতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছে, তাই উঁকি দিয়ে দেখলো একবার করবীদের ঘরটা—ওরা সবাই চলে গেছে আগেই।

ডবল তালা দিয়েই ও বের হোল। গ্রামের চেনা পথ। ভয়ের কোনো কারণই নেই। খানিকটা এসেই রাকাদের বাড়ীর ভাঙা দালান—ইটের স্তূপ—তার পাশে সুড়ি রাস্তা, আলো-

অন্ধকারে দুর্গম হয়ে উঠেছে। আস্তে ও এগুচ্ছে,—শুনতে পেল, কে যেন কাকে বলছে,—

—মা, দেশের মা আর জগতের মা একই—তাঁরই উপাসনা করবো।—গলাটা রোহিতেরই নাকি?

লাইব্রেরী থেকে রোহিত এল রাকাদের বাড়ীতে! সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; প্রণব চাটুজ্যে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে কোথায় বেরিয়েছেন। রোহিত এসে ঢুকলো ভেতরে।

—কাকিমা?

—আয়! কাকিমা সস্নেহে আহবান জানালেন। রাকাও ছিল এক কোনে বসে। রোহিতকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলো নীরবেই। রোহিত ওকে বলল,—লাইব্রেরীটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বই পত্র সব লণ্ডভণ্ড—অর্দ্ধেক তো চুরিই হয়ে গেছে, আর চাঁদা এক পয়সাও আদায় হয় না—বুঝলি রাকা?

—হ্যাঁ—রাকা সামান্য একটু হেসেই হুঁ দিল। ওর মা বললেন,—

—বই তো বিস্তর জমে ছিল তোদের! অংশুই তো দুশোর উপর বই দিয়েছিল।

—দিয়ে তো ছিল; সে সব লোপাট হয়ে গেছে। অংশু এসে যে কি বলবে তাই ভাবছি। ও আসবার আগেই সব ঠিক করে ফেলতে হবে।

—ঠিক কি করে করবে তুমি রোহিদা—রাকা বললো—ঠিক করা তো মুখের কথা নয়, টাকা পয়সার দরকার। টাকা তোমাদের আর কেউ বিশ্বাস করে দেবে, ভেবেছ? চাঁদার টাকায় চা আর চানাচুর খাওয়া হয়েছে—সে খবর বহু লোকে জানে। আর বইগুলো গেছে বাড়ী বাড়ী নতুন বৌদের বাক্সে। লাইব্রেরীর বই নিয়ে নতুন বৌকে উপহার দেওয়া হয় এখানে! ওসব করে অনর্থক আর সময় নষ্ট করো না!

—সে কি রে? গেছে বিস্তর! তাই বলে উদ্দেশ্যটাই ছেড়ে দেব এত সহজে? তাহলে জীবনে কাজ করলাম কি? তোর মুখে এ কথা মানাচ্ছে না রাকা!

—না মানালে করছি কি বলো! সত্যি কথা সব সময় মানায় না, তা বলে কথার সত্যতা তো অস্বীকার করতে পার না তুমি! গায়ের রক্ত জল ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চাঁদা আদায় করেছ, বই চেয়ে চেয়ে লাইব্রেরী সাজিয়েছ; উদ্দেশ্য কি, না দেশের মানুষগুলো একটু শিক্ষা লাভ করবে। কিন্তু তোমাদের জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী বদল হোল—আর দিন কয়েকের মধ্যেই লাইব্রেরী গেল জাহান্নমে—যাবার সময় শিখিয়ে গেল বই চুরি করবার বিদ্যে! কি করে রবারের ছাপ তোলা যায়, কি ভাবে পুরোনো বইএর পাতার আগা চেঁছে তাকে নতুন করা যায়—এই সব ফন্দিই খুব ভাল করে শিক্ষা দিয়েছে তোমাদের লাইব্রেরী। ও পণ্ডশ্রম আর করো না রোহিদা…তার থেকে ঘরে ঘুমোনো ভাল!

—তোর দেখছি খুবই রাগ হয়েছে। কিন্তু রাকা, যারা ঐ সব করেছে, তারা আমাদেরই দেশের ভাই-বোন। তাদেরকে

ক্ষমা না করে—ফেলে দিয়ে আসবো—এইটাই কি উচিৎ হোল? তাদেরকে উন্নত করে সঙ্গে আনাই কি উচিৎ নয়?

—আদর্শের দিক থেকে নিশ্চয়ই উচিৎ, কিন্তু আদর্শ ছাড়াও অন্য একটা দিক ভাববার আছে, রোহিদা। আদর্শ সব সময় লোকায়ত্ত হয় না;—কলসীর কাণার মার খেয়ে খেয়ে প্রেম বিলোনোর মত মহান আদর্শ সব সময় সকলের পালন করা সম্ভব নয়। ওরা চুরি করবে আর তোমরা খেটে খুটে যোগাড় করে দেবে ওদের চুরির দ্রব্য, এ কেমন আদর্শ আমি বুঝিনে।

—ওরা বরাবর চুরিই করবে কেন?

—সুযোগ-সন্ধানীরা তাই করে থাকে—যারা মার খায় আর প্রেম বিলোয়, তারা মার খেয়েই কাটায় চিরদিন। বর্ত্তমান কালোবাজারের অসহ্য দুর্নীতি আর আমাদের অসহায় অবস্থা দেখেও যদি তুমি এ সত্য না বুঝে থাক, তাহলে আর বুঝবে না।—রাকা যেন উত্তেজিত হচ্ছে।

ওর চোখের পানে রোহিত একটুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর শুধুলো—তোর এতটা উত্তেজনার সত্যি কারণটা কি, বল তো?

—বলছি যে, তোমার যদি এখন করবার মত অন্য কোনো কাজ না থাকে তবে বাবার কাছে বসে যোগবাশিষ্ট রামায়ণখানা পড়—পরকালে উপকার দেবে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার কিচ্ছু দরকার নেই।

রাকা রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে, রোহিতের জন্যই খাবার আনতে হয়তো। কিম্বা আর কোনো কাজের জন্য, কিন্তু রোহিত ওর কথার কিছুমাত্র অর্থ ধরতে পারলো না। যোগবাশিষ্ট

অবশ্য খুবই ভাল বই এবং পড়বার ইচ্ছাও রোহিতের আছে, কিন্তু আজ এই বর্ত্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার যোগ কোথায় ?

নিতান্ত নির্ব্বোধের মত ও উঠোনে এসে দাঁড়ালো। চাঁদটা প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে, আলোয় ভরে গেছে বিশ্বভুবন। কতদিন রোহিত এমন করে চাঁদের আলোতে দাঁড়ায় নি, এমন করে দেখেনি তার জননী-জন্মভূমিকে। আকাশে বাতাসে বসন্তের মধুগন্ধ,—বিশাল বাড়ীটার আণাচে কাণাচে উপছে পড়ছে জ্যোস্না, দূরের তালগাছের পাতাগুলো চিকচিক করছে সেই আলোতে—বড় সুন্দর লাগছে ওর, কিন্তু রাকার কথাটা ওকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে—কেন রাকা এরকম কথা বললো ! সাধারণ ভাবে এমন অসাধারণ কথা বলবার মত মেয়ে সে নয়—সে ধীরবুদ্ধি এবং চিন্তাশীলা।

কিন্তু ওকে বেশি ভাবতে হোল না, রাকাই এসে দাঁড়ালো, বলল—চা খাবে নাকি আর ? অভয়দার ওখানে নিশ্চয় খেয়েছ একদফা !

—হ্যাঁ খেয়েছি ; আর খাব না চা ! তুই কি যাত্রা শুনতে যাবি নাকি ?

—যেতেও পারি ; ওবাড়ীর বড় বৌদির বোন নিমন্ত্রণ করে গেছেন যেতে ?

—কে বড় বৌদির বোন ? কোথাকার ?

—কলকাতার ! দোলে বোনের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন !

—ওঃ—তাহলে আমায় খেতে দে ! তারপর তোরা খেয়ে যাবি ওখানে !

—মা যাবে না, আমিই একা যাব যদি যাই তো।

—বেশ, তাই যাবি; কিন্তু তুই ওকথা বললি কেন রাকা? আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যদি একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলতে পারি তো দেশের একটা ভাল কাজই হবে; এতে কেন তুই বাধা দিচ্ছিস? এসব কাজে তোর তো বরাবর সমর্থন পেয়েছি আমরা!

রাকা কিছুক্ষণ উত্তর দিল না কিছু—রোহিত তাকিয়ে রয়েছে মুখপানে। রাকা আস্তে বললো,

—বাবা কারো নিন্দে করতে মানা করেন রোহিদা, কিন্তু নিন্দা না করে যে এই দেশের মানুষদের পরিচয়েই দেওয়া যায় না! আমি কেন ওকাজ করতে মানা করছি তা তুমি দুচার দিনেই বুঝবে, আমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি চাই, তোমরা বাবার আদর্শ বজায় রাখ— তোমাদের মধ্যে বাবা যেন চিরকাল বেঁচে থাকেন। এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা! আমাদেরও ইচ্ছা!

—জানি রাকা! তাঁর আদর্শভ্রষ্ট হওয়ার জন্য অনুতাপের শেষ নাই আমার। কিন্তু আর তো তা হচ্ছি না। গুপ্তাঘাত আমি এই জন্মের মত ত্যাগ করেছি। এখন মা, দেশের মা আর জগতের মা আমার কাছে এক; এবার থেকে আমি তাঁরই উপাসনা করবো।

—তাঁরই উপাসনা তোমরা করেছ, শুধু প্রণালিটার বিরোধ বাবার সঙ্গে।

—না, শুধু প্রণালি নয়—আমাদের পদ্ধতিতে সিদ্ধি মেলে না—এটা আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

—বেশ, এখন সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজে করো। লাইব্রেরী করা ভাল কাজ হতে পারে, কিন্তু তার থেকে বেশি প্রয়োজন মানুষ তৈরী করা—দুর্নীতিতে দেশটা ছেয়ে গেল। মানুষকে তার থেকে উদ্ধার করা অনেক বড়ো কাজ নিশ্চয়ই।

রাকা চলে গেল ওর জন্য খাবার ঠিক করতে। কিন্তু কারণটা তো বলে গেল না। রোহিত ভাবতে লাগলো, কেন রাকা তাকে এমন ভাবে নিষেধ করছে এই কাজে যেতে? কিন্তু সে প্রকাশ না করলে তো অন্য উপায়ে জানা সম্ভব নয়। কারো নিন্দা সে করতে চায় না—কিন্তু কে এমন বিশেষ নিন্দার্হ ব্যক্তিটি, যার নাম রাকা করলো না ?

খেতে বসে সে শুধুলো—অভয়ের বৌএর সঙ্গে তোর আলাপ আছে রাকা ?

—হ্যাঁ! প্রায় রোজই দেখা হয় পুকুরঘাটে। আজই হয় নি দেখা!

—আজ সে আমাদের জন্য চা তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল। কী রকম মেয়ে সে ?

—ভালই!

রাকা নিতান্ত নিরস কণ্ঠে উত্তর দিল! রোহিত বিস্মিত হয়ে বলল—অমন করে বললি যে ?

—বললাম—রাকা হাসলো একটু—বললো, মেয়েরা জল, অসীম তার শক্তি কিন্তু যেমন পাত্রে রাখবে তেমনি আকার এবং গুণ হবে। মেয়েরা বাতাস, জীবনস্রোতকে বহমান রাখে কিন্তু কদর্য্যস্থান থেকে দূষিত জীবাণুও নিয়ে আসে। মেয়েরা আগুন,

জীবনকে পরিপুষ্ট করে খাদ্য পেয় দিয়ে, কিন্তু অসতর্কতায় সেই আগুণ গৃহদাহ করে। কোন্ মেয়ে কেমন, তা বলতে যাওয়া নিতান্ত বোকামী। নিজের সম্বন্ধেই বলা চলে না, তা অপরের কথা কি বলব!

রোহিত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাকার মুখপানে, তারপর গলায় দৃঢ়তা এনে বললো,—তোর আত্মবিশ্বাস এতই ক্ষীণ রাকা? আশ্চর্য্য তো!

—আত্মবিশ্বাস? রাকা হাসলো খুব মিষ্টি একটু, হেসে বললো—'আত্মবিশ্বাস' কথাটা ইংরাজি অভিধান থেকে হালে আমদানী; ওদেশের মেয়েরা নিজেদিকে খুবই স্বাধীন মনে করে কি না, তাই ওকথাটা ওদেশেই চলে। ওর খাঁটি ভারতীয় প্রতিশব্দ হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়,—সেটা খুবই আছে আমার!

—তাহলে এমন কথা বলছিস কেন?

—কারণ, আত্ম-বিশ্বাস কথাটায় যে অহঙ্কার-আত্মম্ভরিতা আছে, আত্ম-প্রত্যয়ে তা নেই। আর্য্যঋষিরা নারীর শক্তিতে বিশ্বাস করতেন শুধু নয়, নারীকে তাঁরা পূজাই করতেন। তাঁরা জানতেন, নারীই জীবনস্রোত বহমান রাখে—সে প্রাণ-বায়ু! কিন্তু তাকে স্বাস্থ্যকর স্থান থেকে আনতে হবে, নইলে প্রাণ বাঁচবে না। তাঁরা জানতেন, নারী অগ্নি, তাকে সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা না করলে ধ্বংস অনিবার্য্য—এই জন্যই তাঁরা বিধান জারী করেছেন, নারীর স্বাতন্ত্র্যস্বত্বা পুরুষকে আশ্রয় করেই থাকবে। আগুনকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দেওয়া চলে না—জলকে বাঁধের বাইরে যেতে দেওয়া চলে না, বাতাসকে বীজাণুযুক্ত করা চলে না।

—তোর কি মত, যে, নারী কোনো দিন স্বাতন্ত্র্যোত্থিত হয়ে কিছুই করতে পারে না ?

—অধিকাংশ নারী সম্বন্ধেই ওকথা বলা চলে—অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, তবে কম।

—এর কারণ ?

—কারণ তো বললাম ! প্রচণ্ড শক্তিকে সব সময় নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয়। নইলে যার শক্তি তারই সর্ব্বনাশ ঘটায়। প্রকৃতির সব প্রচণ্ড শক্তির মধ্যেই একরকম অন্ধতা আছে, তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যই পুরুষের দরকার। এই বিরাট সৃষ্টি প্রকৃতির, শুধু তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যই চৈতন্যরূপী পরমব্রহ্মকে স্বীকার করা হয়েছে ! নইলে প্রকৃতির অন্ধ শক্তি সব ভেঙে চুরে একাকার করে দিত !

রোহিত ওর গুরুগম্ভীর কথাগুলো পরিপাক করতে পারছে না, হেসে বললো—

—সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন সব পড়ে ফেলেছিস বোধ হয়—কেমন ?

—পড়ার কিছু দরকার হয় না, চোখ মেলে চাইলেই বোঝা যায়। ঐ নদীর জলে ক্ষেতগুলোর ফসল হয়। কিন্তু জলটা নিয়ন্ত্রিত না কলেই জলপ্লাবন ঘটে যাবে। ঐ আগুনটাকে উনুনে না রেখে ছড়িয়ে দিলেই অগ্নিকাণ্ড ঘটবে—নারী ঠিক তেমনি। ওর শক্তি প্রচণ্ড, তাই তাকে সাবধানে রক্ষা করা দরকার।

রোহিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেমে গেল, তারপর হঠাৎ বললো,

—কিন্তু অভয়ের বৌ সম্বন্ধেই এত কথা উঠলো। ও কি খুব শক্তিমতী নারী?

—নারী মাত্রেই শক্তিমতী—শক্তির ভিতরে অগ্নি আগুন অনেক সময় ছাই চাপা থাকে—ঝরণা পাথরচাপা থাকে। —কিন্তু ওকে জানার কি এত দরকার তোমার?

—মেয়েটিকে আজই দেখলাম। অভয় ওকে পেয়ে সুখী হয়েছে, কি বলিস?

—'সুখ' কথাটা নিতান্তই আপেক্ষিত শব্দ রোহিদা। কার কিসে সুখ, কে কি পেয়ে সুখী হয়, কেউ বলতে পারে না। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, ওরা সুখী। কিন্তু কে বলতে পারে ওদের পরস্পরের সুখের আদর্শে আকাশ জমিন তফাৎ! কে বলতে পারে, ওদের হাসির তলায় কান্নার সাগর নেই?

—তুই বড্ড মিষ্টিক হয়ে উঠছিস রাকা! ওভাবে কথা বললে কোনো লোকের সম্বন্ধেই কথা বলা চলে না!

—না, চলে না! মেয়েরা মিষ্টিক্ তো বটেই, পুরুষরাও কম নয়। কিন্তু তোমার রহস্যভেদী দৃষ্টি আছে, অবিলম্বে ভেদ করে ফেলবে রহস্য!

রাকা হেসে উঠে গেল আর একটা কিছু আনতে। রোহিত নীরবে খেল, ওবিষয়ে আর কোনো কথা সেও কইল না। শুধু রাকাকে বললো—তাহলে কি এখন করা যায়, বল দেখি!

—কিসের কি?—রাকা প্রশ্ন করলো!

—দেশের কাজের!

—করবার বিস্তর আছে! সবার আগে মানুষের মনকে

আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। আগামী পৃথিবীর শান্তিময় দিনের জন্য মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধকে আবার ফিরিয়ে আনুক। পৃথিবীতে আজ সব থেকে বেশী দরকার মানব-নীতি প্রবর্ত্তনের! মানুষ আজ যুদ্ধের কদর্য্যতায় পশু হয়ে উঠেছে—আনবিক শক্তিকে আয়ত্ত করে নিজেকে অজেয় মনে করার অহঙ্কারে মেতেছে, কিন্তু সে ভাবছে না যে ঐ আনবিক শক্তিকে রক্ষা করতে গিয়ে সে ট্রয়ের ধ্বংস বা লঙ্কার দাহন ডেকে আনবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মানবনীতিগত সরলতাকে জটিল রাজনৈতিক অবিশ্বাসের পরিস্থিতিতে ফেলে সে প্রতি-বেশীর চোখে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। আত্মরক্ষার. অজুহাতে প্রতিবেশীও শান দেবে তার নখদন্তে, শাণিত করবে তার তূনীরের শর, তরবারির ধার! শান্তিক পৃথিবীতে শক্তির মাতামাতিই চলছে আজ, তাকে শান্ত করতে দরকার আজ মানব-নীতির প্রবর্ত্তন!

—কিন্তু কে তা করবে?

—তুমি, আমি, আমরা, এই ভারতবাসীরা! শান্তিমন্ত্রের উদ্গাতা এই সুপ্রাচীন জাতিই আবার মানুষের মনে মানুষের নীতি জাগ্রত করবে। তার সূচনা বহুদিন পূর্ব্বেই দেখা দিয়েছে আমাদের মহামানব মহাত্মাজীর মধ্যে। আজ তাঁর মহতী বাণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে এসিয়া মহাসম্মেলনের আয়োজনে এবং প্রয়োজনে! কাজ বিস্তর করবার আছে রোহিদা!

—অংশু আসুক! সকলে মিলে একটা প্ল্যান ঠিক করা যাবে।

রাকা চুপ করে রইলো এবার। রোহিত খেয়ে চলে গে যাত্রার ওখানে।

রুক্মিণী নিমন্ত্রণ করে এসেছে রাকাকে যাত্রার আসরে তাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য! ওরা একসঙ্গেই বসবে আর গল্প করবে! কিন্তু রুক্মিণী তার সান্ধ্যপ্রসাধন করতে করতে ভাবছিল, রাকার সঙ্গে কথা বলে নিজের প্রাধান্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। অতি তুচ্ছ কথাকেও ঘুরিয়ে সে এমন বাক্-বিস্তার করবে. যে রুক্মিণীর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হবে তার আভ্যন্তরীন অর্থ বুঝতে! এই অজ্ পাড়া গাঁয়ে কেমন করে অত বিদ্যে আর অমন মৌলিক চিন্তাশক্তি অর্জন করলো রাকা? বিস্মিত হবার কথা, কিন্তু রুক্মিণীর মনে পড়লো, প্রণব চাটুজ্যের দিব্য মূর্ত্তিখানা! ঐ বাপেরই মেয়ে তো! তুচ্ছ তমাল গাছের পাতাঝরার কাহিনীকে কি রকম ভাবে তিনি জাতীয় জীবনের মর্ম্মবেদনার মূ নিয়ে গেলেন! ওদের সঙ্গে মিতালি রাখতে হলে নিজেকেও ঐ ভাবে ভাবিত করতে হবে।

—যাত্রা শুনতে যাবি তো? সত্যভামা প্রশ্ন করলো!

—হ্যাঁ! ও বাড়ীর রাকা আসবে, বলেছে। ও এলে একসঙ্গে যাব!

—রাকার সঙ্গে তোর বেশ ভাব হোল তো রুক্মিণী?

—হ্যাঁ! কেন দিদি? রাকা তো খুবই ভালো মেয়ে!

—ভালো তো নিশ্চয়ই। প্রণব চাটুজ্যের মানস-সৃষ্টি

রাকা। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আর মানুষের মানসিক ঐশ্বর্য্য ওর বাবার পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী ও। কিন্তু ওর সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব ঠিক হবে না!

—কেন দিদি? কেন? কেন?—রুক্মিণী ব্যগ্র প্রশ্ন করলো!

—রাকা চাঁদের আলোর মত সুন্দর। কিন্তু ওর অন্তরটা সব সময় জ্বলছে, যে কাছে যাবে ওর, তাকেই ও জ্বালিয়ে দেবে। ওকে এড়িয়ে চল।

—জ্বলছে? কেন? কিসের জন্য?

—সে তুই বুঝবি না! আমিও ভালরকম বুঝি না। তোর জামাইবাবুর কাছে শুনেছি, ওরা চার পুরুষ ভারতের স্বাধীনতা দেখবার জন্য সাধনা করছে! প্রণব চাটুজ্যে বলেন, ভারতের স্বাধীন মৃত্তিকা না পেলে তিনি মরবেন না! রাকা সেই বাপের হাতে গড়া মেয়ে! ওর আদর্শ, ওর নাম, ওর কথা সবই অন্য রকম। কারো সঙ্গে মেলে না! আমাদের বাবা সরকারী খেতাবের আওতায় আছেন, দাদাও সরকারী চাকুরে। তোর জামাইবাবুও সরকার ভক্ত মানুষ! তাই ওরা খুব নিকট আত্মীয় হলেও আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। আমরাই সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি!

—আজকালকার দিনে এমন কথা বলা খুব লজ্জার বিষয় দিদি। এখনো যদি তোমাদের এতখানি নীচতা থেকে থাকে, তাহলে আমার এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে।

রুক্মিণী কথাগুলো খুব ঝাঁজের সঙ্গেই বললো, কিন্তু সত্য-ভামা অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির মেয়ে। কিছুমাত্র উত্তেজিত না

হয়ে সে বললো,—দেশের স্বাধীনতা সকলেই চায়, কিন্তু তাতে সক্রিয় সহযোগিতা করা সকলের পক্ষে সব সময় সম্ভব নয় রুক্মিণী। আমরা তাঁদের অন্তর দিয়ে সমর্থন করি, কিন্তু বাইরে ব্যবধান রাখতেই হয়।

—কারণ? রুক্মিণী তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো—তোমার কোন্ খেতাবটা বাতিল হবে?

—খেতাব বাতিল না হোক, বিপদের সম্ভাবনা বিস্তর। অথচ আমরা এখন বিশেষ কিছুই করতে পারবো না, যাতে দেশ স্বাধীনতার পথে এক চুল এগোয়।

—নিশ্চয় পার এমন কিছু করতে, করতে চাও না, তাই বলো। পদ্যপাঠে পড়েছি—

"সুকেশিনী শিরোশোভা কেশের ছেদনে—
ক্ষুব্ধা নহে যদি তাহে হয় উপকার—"

মাথার চুল কেটে দিয়েও একদিন পরাধীন দেশের মেয়েরা স্বাধীনতাকে আনতে চেয়েছিল! কিন্তু তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই দিদি, ইতিহাস পড়িয়েও তোমাকে বোঝানো যাবে না! তবে অন্তরে যেটা সমর্থন করো, বললে, বাইরে তাকে সমর্থন না করো, অন্ততঃ বিরুদ্ধাচরণ করো না!

রুক্মিণী সবেগে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। প্রসাধন ওর শেষ হয়ে গেছে। অতি সাধারণ শাড়ী, ব্লাউস, হাতে সোনার চুড়ি দু' গাছা, মুখটা ভিজে গামছা দিয়ে একটু মুছে নিল মাত্র এবার ও যাবে যাত্রার আসরে। সত্যভামা বললো,—

—ও কি হোল? গয়নাগুলো সব খুলে ফেললি যে?

—রাকার মত মেয়ের কাছে একপা' … পরে বসতে আমার লজ্জা করে।

—ঐ জন্যেই তো বলছিলাম, ও চুম্বক; ম্যাগনেটিক আকর্ষন ওর। তোমাকেও চুম্বকধর্ম্মী করে ছাড়বে।

—তাহলে আমার ভাগ্য মনে করবো—রুক্মিণী গম্ভীর গলায় বললো।

—বাবা বাড়ী ঢুকতে দেবে না, জানিস? এতক্ষণে সত্যভামার কণ্ঠে সামান্য বিরক্তির ঝাঁঝ দেখা গেল। কিন্তু রুক্মিণী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো—পৃথিবীতে বাবার বাড়ী ছাড়াও বিস্তর যায়গা আছে।

বলেই রুক্মিণী চলে গেল একা যাত্রার আসরের দিকে। সত্যভামা অবাক হোল না, কলেজে পড়া বোনকে সে চেনে। আদরে আদরে ওর মাথাটি খাওয়া গেছে একেবারে। যখন যা জিদ ধরবে, করে তবে ছাড়বে। আজ যাকগে, কালই ওকে সামলে নিতে হবে; নইলে কলকাতায় পাঠি… দিতে হবে। অনর্থক বিপদ বরণ করতে সত্যভামা প্রস্তুত ন… কারণ, সে এই দুই বছর ধরে দেখছে—প্রণব চাটুজ্যের বাড়ীতে বছরে চার-পাঁচ বার খানাতল্লাসী হয় আর তাঁর সঙ্গে যাদের একটু মাখামাখি ভাব, তাদেরকেই হেস্তনেস্ত হতে হয় পুলিশের হাতে। এখন গ্রামের সকলেই ওঁদের এড়িয়ে চলেন! সত্যভামার স্বামী তো বিশেষ রকম ভাবে এড়িয়ে চলেন ওঁদের। শুধু শাশুড়ীই যা, পূর্ব্ব সম্পর্কের খাতিরে ওঁদের সঙ্গে দেখা হলে মৌখিক খাতির করেন। অন্তরে তিনিও কম শঙ্কিত নন।

সত্যভামা ঘরের জানালা থেকেই দেখলো, রুক্মিণী চলে গেল বরাবর—চিকের আসনের দিকে। কে একজন ঐখানে ভোলান্টিয়ার রয়েছে—রুক্মিণীর সঙ্গে কি যেন কথা কইল সে! রোহিত নয় তো? সত্যভামা আরো বিরক্ত হোল। সোমত্ত কুমারী মেয়ে—ওভাবে কথা কয় কেন সোমত্ত ছেলের সঙ্গে? না—ওকে আর এখানে রাখা হবে না! কিন্তু ঐ ভোলান্টিয়ারটা আলোর দিকে এগিয়ে আসতেই সত্যভামা দেখতে পেল, সে রোহিত নয়, সত্যভামার খুড়শ্বশুরের ছেলে অম্বুজনাথ!—এম্, এস্-সি পাশ করে পুণায় গবেষণা করে কি যেন একটা বিষয়ে। দোলে বাড়ী এসেছে। সত্যভামার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। অম্বুজ ঠাকুরপো বড় ভাল ছেলে। রুক্মিণীর সঙ্গে ওকে চমৎকার মানাতে পারে!

মানুষের স্বার্থান্বেষী মনকে ধন্যবাদ দিতে হয়! নয় কি?

কিন্তু রুক্মিণী কি কথা বললো অম্বুজের সঙ্গে, সত্যভামা জানতে পারলো না; জানলে ওর এতটা উচ্ছ্বাস জুড়িয়ে যেত তখুনি। রুক্মিণী বলল,—ও সর্দার মশাই, শুনছেন, ওবাড়ীর রাকাকে একটু ডেকে দেবেন তো!

অম্বুজ বেচারা বুঝতেই পারলো না, কেন তাকে সর্দ্দার বলে সম্বোধন করা হোল। ভোলান্টিয়ারের বাংলা প্রতিশব্দ 'সর্দ্দার' নাকি? অথবা ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে ও! কিন্তু অম্বুজ ভাববার সময় পেল না।

—যান-না, ডেকে আনুন; বলুন, রুক্মিণী ডাকছে।—রুক্মিণী আবার বললো।

—রাকার মত মেয়ের কাছে একগা' গয়না পরে বসতে আমার লজ্জা করে।

—ঐ জন্যেই তো বলছিলাম, ও চুম্বক; ম্যাগনেটিক আকর্ষন ওর। তোমাকেও চুম্বকধর্ম্মী করে ছাড়বে।

—তাহলে আমার ভাগ্য মনে করবো—রুক্মিণী গম্ভীর গলায় বললো।

—বাবা বাড়ী ঢুকতে দেবে না, জানিস? এতক্ষণে সত্যভামার কণ্ঠে সামান্য বিরক্তির ঝাঁজ দেখা গেল। কিন্তু রুক্মিণী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো—পৃথিবীতে বাবার বাড়ী ছাড়াও বিস্তর যায়গা আছে।

বলেই রুক্মিণী চলে গেল একা যাত্রার আসরের দিকে। সত্যভামা অবাক হোল না, কলেজে পড়া বোনকে সে চেনে। আদরে আদরে ওর মাথাটি খাওয়া গেছে একেবারে। যখন যা জিদ ধরবে, করে তবে ছাড়বে। আজ যাকগে, কালই ওকে সামলে নিতে হবে; নইলে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে। অনর্থক বিপদ বরণ করতে সত্যভামা প্রস্তুত নয়। কারণ, সে এই দুই বছর ধরে দেখছে—প্রণব চাটুজ্যের বাড়ীতে বছরে চার-পাঁচ বার খানাতল্লাসী হয় আর তাঁর সঙ্গে যাদের একটু মাথামাখি ভাব, তাদেরকেই হেস্তনেস্ত হতে হয় পুলিশের হাতে। এখন গ্রামের সকলেই ওঁদের এড়িয়ে চলেন! সত্যভামার স্বামী তো বিশেষ রকম ভাবে এড়িয়ে চলেন ওঁদের। শুধু শাশুড়ীই যা পূর্ব্ব সম্পর্কের খাতিরে ওঁদের সঙ্গে দেখা হলে মৌখিক খাতির করেন। অন্তরে তিনিও কম শঙ্কিত নন।

সত্যভামা ঘরের জানালা থেকেই দেখলো, রুক্মিণী চলে গেল বরাবর—চিকের আসনের দিকে। কে একজন ঐখানে ভোলা-ন্টিয়ার রয়েছে—রুক্মিণীর সঙ্গে কি যেন কথা কইল সে! রোহিত নয় তো? সত্যভামা আরো বিরক্ত হোল। সোমত্ত কুমারী মেয়ে—ওভাবে কথা কয় কেন সোমত্ত ছেলের সঙ্গে? না—ওকে আর এখানে রাখা হবে না! কিন্তু ঐ ভোলান্টিয়ারটা আলোর দিকে এগিয়ে আসতেই সত্যভামা দেখতে পেল, সে রোহিত নয়, সত্যভামার খুড়শ্বশুরের ছেলে অম্বুজনাথ!—এম্, এস্-সি পাশ করে পুণায় গবেষণা করে কি যেন একটা বিষয়ে। দোলে বাড়ী এসেছে। সত্যভামার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। অম্বুজ ঠাকুরপো বড় ভাল ছেলে। রুক্মিণীর সঙ্গে ওকে চমৎ-কার মানাতে পারে!

মানুষের স্বার্থান্বেষী মনকে ধন্যবাদ দিতে হয়! নয় কি?

কিন্তু রুক্মিণী কি কথা বললো অম্বুজের সঙ্গে, সত্যভামা জানতে পারলো না; জানলে ওর এতটা উচ্ছ্বাস জুড়িয়ে যেত তখুনি। রুক্মিণী বলল,—ও সর্দ্দার মশাই, শুনছেন, ওবাড়ীর রাকাকে একটু ডেকে দেবেন তো!

অম্বুজ বেচারা বুঝতেই পারলো না, কেন তাকে সর্দ্দার বলে সম্বোধন করা হোল। ভোলান্টিয়ারের বাংলা প্রতিশব্দ 'সর্দ্দার' নাকি? অথবা ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে ও! কিন্তু অম্বুজ ভাববার সময় পেল না।

—যান-না, ডেকে আনুন; বলুন, রুক্মিণী ডাকছে।—রুক্মিণী আবার বললো।

—যাচ্ছি—কথাটা উচ্চারণ করবার আগেই রুক্মিণী চিক-দেওয়া ঘরে চলে গেছে। অম্বুজ অবাক হোল, আনন্দিতও হোল। বড়বৌদির বোন, অম্বুজ জানে, সে এসেছে এখানে, কিন্তু দেখা হয়নি—কথা তো নয়ই। বেশ তো মেয়েটি, বেশ সপ্রতিভ আর সাবলীল! তরুণ অম্বুজের মানসলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এক মানসীর আবির্ভাবে। কিন্তু রাকাকে ডাকতে আদেশ করেছে ও। কাজটা খুব সোজা নয়, ভাঙ্গা ইট-কাঠ-পাথর পার হয়ে সেখানে যাওয়াই তো মুস্কিল এই সন্ধ্যার অন্ধকারে। তারপর প্রণব চাটুজ্যের সামনে যেতেও ভয় করে, কে জানে কি প্রশ্ন করে বসবেন! সবার উপর, রাকা সম্বন্ধে ওর একটা আজগুবী ধারণা আছে, যেন মেয়েটা সবজান্তা। কে জানে কি বলে বসবে! হয়তো, তার বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের মনের কথাটাই ধরে ফেলবে।

তবু অম্বুজ গেল রাকাকে ডাকতে। অমন একটা সুন্দরী মেয়ে, কুটুম্বের মেয়ে রুক্মিণী, তার অনুরোধ না রেখে পারা যায় কি! কিন্তু রাকাকে ওর কি দরকার হচ্ছে? যতদূর জানা আছে, রাকাদের সংসর্গ এখানে সকলেই এড়িয়ে চলে—রাকার উপর ঐ মেয়েটির আকর্ষণের হেতুটা কি ঐ জন্যই! ভাবতে ভাবতে অম্বুজ যাচ্ছিল অন্যমনস্ক হয়েই, হঠাৎ একটা মেয়ের গায়ে ধাক্কা লেগে গেল—রাকা নয় তো?

না, মেয়েটি সরে দাঁড়ালো, ঘোমটাটা টেনে দিল। কাদের বউ যেন। অম্বুজ লজ্জিত হোল, পাশ কেটে যেতে যেতে বলল —ক্ষমা করবেন, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম।

কার জন্য অন্যমনস্ক ছিল ও ? রাকার জন্যই নাকি। বৌটিও ভাবতে ভাবতে চলে এলো যাত্রার কাছে। কে ও ? ঐ কি বিকেলে তার বাড়ীতে গিয়ে চা খেল ? হ্যাঁ, ঐতো ! ও তাহলে রাকার জন্যই অন্যমনস্ক ছিল। তা হবে, রাকার মত মেয়ে তো ওরই যোগ্য। কিন্তু আমার গায়েও ধাক্কাটা বড্ড জোর লেগেছে। এ কি রকম ভদ্রলোক গা ! এমন কিছু অন্ধকার নেই, আকাশে চাঁদ রয়েছে, আর একটা মেয়েমানুষের গায়ে দিল ধাক্কা ! ইচ্ছে করেই দিয়েছে ধাক্কাটা। রাকাই ভেবেছিল আমাকে নিশ্চয়, নইলে অমনি করে কি কেউ ধাক্কা দিতে পারে ! হুঁঃ !

কিন্তু মেয়েটা একবারও ভাবলো না যে তারও কপালের নীচে দুখানা বড় বড় চোখ আছে এবং আকাশের চাঁদ তার জন্যও ছিল—সে ইচ্ছে করলেই ধাক্কাটা এড়িয়ে যেতে পারতো। এড়িয়ে যায়নি, কারণ, বিকালের সেই চা-খাওয়া লোকটার গায়ে যদি একটু গা তার ঠেকে তো কি এমন ক্ষতি হবে ? ঠেকে তো ঠেকুক না। এই চিন্তাটা ঠিক এমনি ভাবে ও করেনি,—কিন্তু এইটাই ওর অতল মনের অনাবিষ্কৃত চিন্তা !—ও চলে এল যাত্রার আসরে।

অম্বুজ চলে গেল রাকাদের দুর্গাদালান পর্য্যন্ত ; তমাল গাছটার তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার যেন ভূতের মত বসে রয়েছে। আর তার কাছেই সাদা মত কি একটা—ছুটে অনেকখানা পিছিয়ে এলো অম্বুজনাথ। বৈজ্ঞানিক অম্বুজ ভূতের ভয় নিশ্চয় করে না, কিন্তু সাপের ভয়তো আছে ! তবে ওটা সাপ নয় নিশ্চয়। অমন পাহাড়ের মত সাপ হয় না। কি ওটা ? ভূত নাকি ?

নাঃ—অম্বুজ আর এগুতে পারবে না। সে আরো কিছুটা পিছিয়ে এসে যাত্রার আসরের কাছাকাছি একটা পান-বিড়ির দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। রাকা নিশ্চয় এই পথ দিয়েই যাবে, অম্বুজ তখনি তাকে বলে দেবে যে বড়বৌদির বোন তাকে ডাকছে।

ওদিকে চিকের আড়াল থেকে রুক্মিণী দেখতে পাচ্ছে এপাশের পানের দোকানটা, পেট্রম্যাক্সের আলোতে অম্বুজের চেহারাটাও দেখতে পাচ্ছে সে। রাকাকে ডেকেই তাহলে ওখানে এসে দাঁড়ালো অম্বুজ। রুক্মিণী প্রতীক্ষা করছে রাকার জন্য। কিন্তু কোথায় রাকা? আসবার নামটি নেই। বিরক্ত হচ্ছে রুক্মিণী। ওদিকে যাত্রা জমে উঠেছে। মেথর আর মেথরাণীর প্রেমের ন্যাকামী আর রঙ্গের গানে শ্রোতার দলে বিস্তর 'বাহবা' পড়ছে। রুক্মিণীর একদম ভালো লাগছিল না। এই ট্র্যাস গান, অসভ্য ইতরামি দেখতে হবে নাকি? ওর রুচিবাগিস শিক্ষিত মন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশ। দিদির সঙ্গে বাদানুবাদটাও এই ক্লান্তির মূলে কাজ করছে। রুক্মিণী ঐ পানের দোকানটার পানে চেয়ে অম্বুজকে দেখলো—কে ঐ ছোকরা?

দেখতে শুনতে অম্বুজ ভালই। বিশেষ এতদূর থেকে ওকে আরো ভালো দেখাচ্ছিল। যেই হোক, এই গাঁয়েরই ছেলে—কাজেই ও নিশ্চয় রোহিতের বন্ধু হবে—কিন্তু রোহিত কোথায়?

চারদিকের অগণ্য উপবিষ্ট লোকগুলোর দিকে তাকালো রুক্মিণী। রোহিতকে কোথাও দেখতে পেল না। আসেনি নাকি? অসুখ করেনি তো? যা ধুলোকাদাগুলো মাখলো

কাল ! ওটা কী রকমের আমোদ ? ধুলো মেখে হোলী না-ইবা খেলতো ও !

একটা বাচ্ছা ছেলে-ভোলান্টিয়ার শুধুতে এলো, মেয়েদের কারো কিছু দরকার আছে কি না। কেউ পান আনতে দিল, কেউ বা চা আনতে দিল। ওপাশের একটা বৌ ছেলেটিকে ডেকে বললে —মুটু ! তোমার দাদাকে বলে দিও, যে বৌদি এসেছে। চাবির দরকার হয়তো যেন চেয়ে নেয়। আমি এইখানে বসলাম !

—আচ্ছা—বলে মুটু চলে যাচ্ছে, রুক্মিণী ওকে ডেকে কাণে কাণে বলল,—রোহিত বাবু আছেন কি ভাই ?

—না ! রোহিদা তো আসে নি !

—ঐ যে পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি কে ?

—ও তো অম্বুজদা ! রোহিদা নয়—রোহিদা আরো ফর্সা !

—আচ্ছা, যাও !—রুক্মিণী ওকে ছেড়ে দিল।

ছেলেটা এমন মুখ্যু ! তোর রোহিদা আরো ফর্সা তা যেন আমি জানি না। কিন্তু ও বড্ড ছেলেমানুষ ; ঐটুকু ছেলে যে ভোলান্টিয়ারী করছে এতেই ওর যথেষ্ট বাহাদুরি। রুক্মিণী আবার বসে পড়লো নিজের জায়গায়। সব মেয়েরা তন্ময় হয়ে যাত্রা শুনছে। শ্রীরামচন্দ্র মিথ্যা অপবাদে সীতাকে বনবাস দেবেন—লক্ষণকে আদেশ করছেন—"রথে চড়িয়ে সীতাকে বাল্মিকীর তপোবনে রেখে এস—"

নিষ্ঠুর স্বামীর নির্ম্মম আদেশের অত্যাচার। আধুনিকারা

উগ্র প্রেতিবাদের জন্য কথায় শাণ দিতে চাইছে, কিন্তু কথা কে শুনবে এখানে? বুড়িগুলো আহা! আহা! করছে, আর আধ-বুড়িগুলো ছেলের পিঠে চাপড় দিয়ে বলছে—ঘুমো, ঘুমো!

ওদিকের সেই বৌটা হঠাৎ চাপা লাগায় পাশের করবীকে বললো,—স্বামীর অত্যাচার চিরকালই আছে। সত্যি যুগই কি, আর ত্রেতা যুগই কি, আর কলি যুগই বা কি! রুক্মিণী শুনতে পেল ওর কথাটা। কে মেয়েটা? বেশ বলে তো!

রাকা আসছে, দেখতে পেল অম্বুজনাথ। কি একটা জানোয়ারের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল রাকা। জ্যোৎস্নার আলোতে ওর সাদা শাড়ী আর পশুটার শাদা রং বেশ দেখতে পাচ্ছে অম্বুজ! ওঃ, গাঁয়ের ধর্ম্মের ষাঁড়টা! ঐটাই তমাল তলার আঁধারে দাঁড়িয়ে ছিল তাহলে। এ্যাঃ! অম্বুজ খামোকা ভয় পেয়েছে।

—ওরে, তোকে বড়বৌদির বোন ডাকছে!—রাকা কাছে আসতেই অম্বুজ বলল।

—যাচ্ছি!—রাকা আর কোনো দিকে না চেয়ে চলে এল চিকের মধ্যে! রুক্মিণীও দেখতে পেয়েছে—উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরলো রাকার। ওর জন্য বসবার জায়গাটা এতক্ষণ থেকে আগলে আছে রুক্মিণী। ওকে বসিয়ে বললো—এতো দেরী করলেন যে? সীতাকে বনবাসে দিয়ে এল; ঐ দেখুন না, সীতা একলা বনের মধ্যে যাচ্ছে!

রাকার চোখে যেন কোন অতীত যুগের বিরহবেদনা জেগে উঠলো, ভবভূতির অমর কাব্যের একটি লাইন মনে পড়ে গেল ওর ; বল্‌লো, আহা, 'মূর্ত্তিমতী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী !'

হয়তো আরো ও বলতো, কিন্তু ওর উচ্ছ্বাসটায় বাধা দিয়ে রুক্মিণী বলল,—রামের এই অত্যাচার কিছুতেই সমর্থন করা যায় না ভাই। আপনি কি বলেন ?

—কাব্যকে কাব্যের আদর্শ দিয়ে বিচার করতে গেলে, সীতার বনবাসের প্রয়োজন আছে, নইলে রামের বিরহযন্ত্রণা ফোটানো চলে না, আর স্বামীর জন্য সীতারও সর্ব্বস্বত্যাগের, সর্ব্বসহিষ্ণু হবার অপূর্ব্ব চরিত্র দেখানো যায় না। বাল্মিকী তার মানস-দুলালী সীতাকে অকারণ লাঞ্ছিত করেননি—তাঁর কাব্যের সীতা সাধারণ মানবী নন, তিনি মূর্ত্তিমতি বিরহশ্রী !

—কিন্তু বাস্তব চরিত্রের দিক থেকে……রুক্মিণী প্রশ্নটা শেষ করলো না !

—শ্রীরামচন্দ্র গণাধিপতি সম্রাট ! প্রজানুরঞ্জনই তাঁর আদর্শ। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন নিতান্তই তুচ্ছ। ভারতের তদানিন্তন রাজ্যের গণ-নেতৃত্বের এই ছিল আদর্শ—প্রজার মতামতকে কতখানি প্রাধান্য দেওয়া হোত, রামরাজত্ব তার ঐতিহাসিক প্রমাণ !

—শূদ্রককে হত্যা ?

—হত্যা নয়—বিদ্রোহীর শাস্তি ! অধিকারী-ভেদ স্বীকার করা হয়েছে ভারতের শাসনধর্ম্মে ! অনধিকারীর যজ্ঞকাণ্ড সমাজে বিশৃঙ্খলা আনতে পারে, স্ব স্ব বৃত্তি ত্যাগ করে যে যার খুশী মত

কাজ করে সমাজ-জীবনকে অচল করে তুলতে পারে, তাই ঐ শাস্তি! All logical

—কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তো ওগুলো চলছে না!

—চলছে—চলবে,—চলতে বাধ্য হবে। তবে অন্য রকম রং মেখে চলবে। বর্ত্তমান সাম্যবাদ বা সমানাধিকারের স্বাধীনতা-বাদের মূলে কি রয়েছে, ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা; বুঝে দেখুন, অপর একজনের তুলনায় আপনার ধন-সম্পত্তি সুখ-সুবিধা কম হওয়ার দুঃখ আর নৈরাশ্য ছাড়া এই মতবাদের আর কোনো ভিত্তি নেই। এই আত্মপ্রীতি আজকার মানুষের মনে বেশি করে প্রভাব দিচ্ছে,—তাই এই সাম্যবাদের বিচারে কেবলই টাকাকড়ি, গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি পাওনা-গণ্ডার কথাই মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তারা ভাবতে চায় না যে জুতো-তৈরীকারীর থেকে কাপড়-তৈরিকারীর মূল্য বেশী। কারণ জুতো একদিন না পরলে চলে, কাপড় চাই-ই। কাজেই কাপড়-তৈরীকারীর অর্থ, মান এবং সামাজিক সম্মান বেশি হবেই। তাছাড়া কাপড় তৈরীর জন্য যে ইঞ্জিনিয়ার কল তৈরী করে তার বৃত্তি এবং মস্তিষ্ক আরো উন্নতধরণের—কাজেই তার সম্মান এবং অর্থ তদনুপাতে বেশী হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত শক্তির উৎকর্ষকে উপেক্ষা করে সবাই সমান হওয়ার ইচ্ছার মূলে রয়েছে মানুষের অহঙ্কার—'আমি ওর থেকে ছোট কিসে?' এই হামবড়ামীর ভাব। কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সেই—"হতে পারতেম আমি একটা" সত্যি নয়। হতে সকলেই পারে না। অধিকার-ভেদ এবং উত্তরা-ধিকার-শক্তি স্বীকার করতেই হবে মানুষকে। বুদ্ধির উৎকর্ষ

বংশানুক্রমে ঘটে থাকে—এবং সেই অধিকার মেনে চলাতেই সমাজের উৎকর্ষ হয়।

—কিন্তু আমাদের এই যে ছোঁয়া-ছুঁয়ীর ব্যাপারটা…।

—ওটা খুব আধুনিক যুগের অন্যায়ের চিহ্ন। ও জিনিষ ছিল না ভারতে! ঐ রামচন্দ্রই চণ্ডালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, বানরের সঙ্গে মৈত্রী পাতিয়েছেন। সমাজে অধিকার ভেদ ছিল কিন্তু ছুঁৎমার্গ ছিল না—ওটার ইতিহাস অন্য রকম—সে ইতিহাস অবশ্য পঙ্কিল,—অন্য একদিন আলোচনা করবো!

পাশের মেয়েগুলো বিরক্ত হচ্ছিল ওদের কথাবার্ত্তার জন্য। তারা যাত্রা শোনার অসুবিধা বোধ করছে। যাত্রা শুনতে গিয়ে এরকম খোসগল্প নিয়ে মেতে থাকা অপর শ্রোতাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য, বিশেষতঃ নারী-মণ্ডলীতে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে মেয়েরাই এরকমটা বেশী করে থাকেন। যাইহোক, রাকা থেমে গেল। রুক্মিণীও বুঝে দেখলো—এভাবে যাত্রা শুনতে এসে এসব আলোচনা করা তাদের উচিত নয়। ও কথা বাদ দিয়ে কানে কানে রাকাকে শুধুলো—রোহিত বাবুকে চেনেন আপনি?

—হ্যাঁ—কেন?

—উনি কে হন আপনার?

—আমার দাদার বন্ধু, বাবার ছাত্র—আমারও…! কাল সবে এসেছে জেল থেকে!

—উনি যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন!

—ওঃ—আপনাদের ওখানে কি ভাবে গেলেন ?

—আমার ছোটদার সঙ্গে আলাপ আছে! দুদিন ছিলেন আমাদের বাড়ীতে লুকিয়ে!

—হবে! আমার সঙ্গে ওসব কথা এখনো হয়নি ওর। আমার দাদা তো এখনো খালাস পায় নি! দাদা না এলে কিছুই জমছে না!

—আপনার দাদার নাম ?

—শ্রীঅংশুমালী চট্টোপাধ্যায়। আর ছোটদার নাম শ্রীমন্দার নাথ চট্টোপাধ্যায়।

—আপনার নাম রাকা দেবী। ভারী সুন্দর নামগুলি আপনাদের!

—আপনাদের নামও তো খুব সুন্দর—সত্যভামা, রুক্মিণী! আপনাদের মা-বাবা নিশ্চয় খুব কৃষ্ণভক্ত মানুষ ?

—মোটে না! আমাদের বাড়ীতে কালী বা কৃষ্ণের কোনো ছবি পর্য্যন্ত নেই। লক্ষ্মী, ষষ্ঠী কোনো পূজোও হয় না কখনো আমাদের। গঙ্গায় আমি জীবনে কখনো স্নান করিনি—যা নোংরা জল! ছিঃ!

পাশের মেয়েগুলো বিরক্ত হচ্ছে খুবই, এবং রাকাও। তবু বাবুদের বড় বৌএর বোন আর গ্রামে নবাগতা মেয়ে বলে রুক্মিণীকে ওরা এপর্য্যন্ত ক্ষমা করছিল, কিন্তু একটা ঠোঁট কাটা মেয়ে বলল,—গঙ্গাজল নোংরা, কিন্তু নিঃশব্দে বয়ে যায়। তুমি যে দেখছি নালার জলের চেয়ে বেশী চেঁচাচ্ছ!

রাকা চেয়ে চেয়ে দেখলো, মেয়েটা কমলা। বড় লোকের

বাড়ী বিয়ে হয়েছে। স্বামীর কাছে কলকাতায় থাকে, কাউকে খাতির করে না মেয়েটা। কিন্তু রাকার খুব দুঃখ হোল, চাপা গলায় বললো—ছিঃ কমলা, অমন অভদ্র কথা কেন বললি ?

—ভদ্র হবি তো বাড়ীতে গিয়ে হ'। এখানে আমরা যাত্রা শুনতে এসেছি—কারও গঙ্গাজলের নোংরামি শুনতে আসিনি।

রাকা চুপ করে গেল। রুক্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করেছে। কিন্তু পল্লীর মেয়েরা এসব কথা কাটাকাটিকে নিতান্ত উপেক্ষাভরে দেখে। অতটা লজ্জিত হবার কোনো কারণ ছিল না রুক্মিণীর। ওপাশ থেকে সেই বৌটি এগিয়ে এসে বললো চাপা গলায়, —আজ যে জলকে যাওনি ভাই রাকা ?

রাকা ওর ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করিয়ে দিল।

উঠতে বেলা হয়ে গিয়েছিল বৌটার। যাত্রা শোনার জন্য রাতজাগা ঘুম। স্বামী রাত্রে বাড়ীই ফেরেনি। সকালে এসেই বৌকে গোটাকয়েক চড় চাপড় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বৌ-মানুষের অতখানি নবাবী করে অত বেলা অবধি ঘুমোবার কোনো অধিকার নেই !

তখনো চোখ দুটো লাল ছিল অভয়ের। কিন্তু আজ নাকি কণ্টোলের ইনস্পেক্টার আসবে—তাই চা-খাবার তৈরী করতে হবে এখুনি। অভয়ের রাগটার মুখ্য কারণ ঐ এবং গৌণ কারণটা হচ্ছে, রাত্রে যে ইতর নষ্টা মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তি

করবে, ভেবেছিলো সে কাল একেবারে দেখাই করেনি! হারাম-জাদী কোথায় যে গিয়েছিল!

অমন চমৎকার যার বৌ ঘরে, সে কেন অত নোংরা কাজ করে, আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হবে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে বিবাহিতা বৌকে মারধোর করা চলে, ফুর্ত্তি করায় অসুবিধা হয়।

তা'ছাড়া ওর সমাজে ও নিজেকে পবিত্র এবং চরিত্রবান হিসাবে চালাতে চায়। এই লোক-দেখানো চরিত্র বজায় রাখতে গিয়ে ওকে বিস্তর ঝামেলা সইতে হয়—তার প্রথম এবং প্রধানটা হচ্ছে বৌএর উপর ভালবাসার ভাণ। ঘরের -ভেতর তাকে দুচারটা ঘুসিঘাসা দিলেও বাইরের কেউ সে-তত্ত্ব জানে না: আর বৌটাও এতো ভালো যে কাউকে কিছু বলে তো না-ই, একটু চেঁচিয়ে কাঁদে না পর্য্যন্ত!

অমন চমৎকার বৌ হয় না—অভয় অহঙ্কার করে বলে বন্ধুদের কাছে। নতুন কেউ এলে বউকে ডেকে তার মুখের ঘোমটা খুলে বলে—দেখ ভাই—দেখ!

অবশ্য দেখাবার মত বৌ তার হয়েছে। পাথরে কোঁদা মূর্ত্তির মত গড়ন, আর স্বাস্থ্য তো সালসার বিজ্ঞাপনে দেবার যোগ্য; কিন্তু অভয়ের এমনি করে ওকে টেনে সবার কাছে বার করা বৌটা পছন্দ করে না। অবশ্য রূপের প্রশংসা শুনে ওর গর্ব্বও হয়, আনন্দও হয়, কিন্তু ও যখন ভেবে দেখে যে ওর স্বামীর এমন করে ওকে দর্শনীয় করে তোলার মূলে আছে তার ভালবাসার ভাণ, তার মিথ্যার

কৌশল, তখন সময় সময় নিজের রূপের ওপরও ঘৃণা জন্মে যায় ওর।

ছেলেবেলায় লেখাপড়া সে শিখেছিল কিছুটা। বাংলা যে-কোনো বই পড়তে পারতো—এমন কি শরৎ চাটুজ্যের উপন্যাসও সে পড়েছে,—কিন্তু অভয়ের বাড়ীতে লাইব্রেরী হলে কি হবে, কোনো বই ছোঁবার অধিকার নেই ওর। অভয় মাঝে মাঝে বলে—আজকালকার বই, ছ্যাঃ! খালি চরিত্রহীন মেয়েদের কেচ্ছা!

—তাই তো গাঁয়ের সব মেয়ে পড়ছে—আমার বেলাতেই যত মানা!

অমন খাঁটি সত্যি কথাটা বউ একদিন সাহস করে বলে ফেলে ছিল, কিন্তু অভয় হুঙ্কার দিয়ে বললো—গাঁয়ের মেয়ে সব গোল্লায় যাবে, তাই বলে তুমি যাবে নাকি?

আসল কথা হচ্ছে, অভয় নিজে চরিত্রহীন, তাই বৌটাকেও সন্দেহ করে! অভয়ের চরিত্রহীনতার কথা কিন্তু ওর বৌ ছাড়া আর কেউ জানে না, কারণ অভয় ও বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। যে দু-একটা মেয়ের সঙ্গে সে মেশে, তারা গ্রামের দূর প্রান্তের মেয়ে, এবং টাকার জোরে অভয় তাদের মুখ বেঁধে রেখেছে। কিন্তু অভয়ের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দুচারজন জেনে ফেলেছে তার গুপ্তকথা। তারা কথাটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে না, কারণ, বর্ত্তমান দিনে অভয় গ্রামের এমন একটা ব্যাপারে রয়েছে যেখানে সকলেরই স্বার্থ জড়িত। অন্নবস্ত্রের ব্যাপার সেটা! রোহিত হালে ফিরেছে, তাই অভয়ের

সম্বন্ধে তার জ্ঞান কিছুই নেই। নইলে সে নিশ্চয় ওকে লাইব্রেরীর সেক্রেটারী করতে রাজি হোত না—এবং এই গল্পও লেখা হোত না।

মার খাওয়াটা দুরন্ত হয়ে গেছে অভয়ের বৌ-এর। গা'ঝাড়া দিয়ে উঠে সে ঘরের কাজে লাগলো। চা-খাবার তৈরী করে দিল যথাসময়ে এবং ইন্‌শ্‌পেক্টার তা খেয়ে খুসী হলেন। খাবার সময় অভয়ের বৌ এর পানে একটা চোরা চোখ মেরেও গেলেন তিনি।

ওদের কিন্তু ঐ চোখ-মারা পর্য্যন্তই শেষ। ওর বেশি আর কেউ এগোয় না! আবার কিছুদিন পরে যখন ইন্‌শ্‌পেক্টার আসবে, তখন আসবে আর একজন। এমন করে চোখ মেরে ওদের লাভটা কি হয়!

বিরক্ত হয় বৌটা—বিরক্ত হতে হতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। নিজেকে দর্শনীয় করতে ও আর আগ্রহ প্রকাশ করে না, কিন্তু স্বার্থপর-অভয় ওকে দর্শনীয়ই করতে চায়—তাহলে তার অনেক সুবিধা। বউটাকে লোকের চোখের সামনে ছেড়ে দিয়ে অভয় তার সন্দেহের চাবুক উঁচিয়ে মজা দেখে! এ তার এক আশ্চর্য্য খেলা। বৌটার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে—কিন্তু সাহস কম ছিল; গত রাত্রের ধাক্কাটা ওকে যেন উইংস এর আড়াল থেকে ষ্টেজের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে একেবারে—হাজার দর্শকের সামনে ও যেন অভিনেত্রী হয়ে উঠেছে অকস্মাৎ! কিন্তু দর্শকদের গ্রাহ্য না করাই অভিনয়-নৈপুণ্যের লক্ষণ—কাল যাত্রায় সেটা দেখেছে ও! অতঃপর সাহসটা ওর মনে জাগ্রত হল অমিত পরিমাণে।

প্রাত্যহিক জীবনের কদর্য্যতা থেকে মানুষ নিজকে মুক্ত করতে খুব বেশী যখন উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন অতি সাধারণ মানুষও অসমসাহসিক হয়ে পড়ে। মেয়েদের বেলা একথা বেশি পরিমাণে খাটে, কারণ ওদের জীবনে উচ্ছ্বাসটা অত্যন্ত প্রবল,—যুক্তি-বিবেচনা দিয়ে সে উচ্ছ্বাসকে শাসন করবার ক্ষমতা ওদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় শীঘ্রই। অভয়ের বৌ বহুদিন থেকেই তার প্রাত্যহিক জীবনটার উপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মুক্তির ইচ্ছা তার এপর্য্যন্ত কখনো হয়নি। আর পাঁচজন মেয়ের মত স্বামীর সংসারে সুখে দুঃখে দিন কাটিয়ে দেবার জন্য ও প্রস্তুত ছিল, এবং হয়তো তাই করতো, কিন্তু ওর জীবনে এল বিপর্য্যয়; সে বিপর্য্যয় পারিবারিক কোনো শোকদুঃখ বা অভাব-অভিযোগের রূপ নিয়ে এল না, এল ওর মনের স্থিতিশীলতার শেকড়ে আঘাত করতে করতে। ওকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুললো কয়েকটা মুহূর্ত্তেই। ও আজই সকালে সর্ব্বপ্রথম অনুভব করলো, এমন করে স্বামীর আদর এবং অত্যাচার এক-সঙ্গে সহ্য করে সে নিজকে নিদারুণভাবে অপমানিত করছে। ওর মনে এই আকস্মিক অপমানবোধটা এল কোত্থেকে? আসেনি—এটা ছিল ওর মনের অতল গহ্বরে; দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল—ঘূর্ণীর মতই ভয়াল হয়ে উঠছিল, কিন্তু মনের তলায় ছিল বলে ও জানতে পরেনি। আজ সেই ঘূর্ণী উগ্র মূর্ত্তিতে ফেনিল আবর্ত্ত সৃষ্টি করছে। কিন্তু ও বাংলার চির-সহিষ্ণু নারী—সুতরাং নিজকে সম্বরণ করে গৃহের কাজের ছন্দ বজায় রাখবার চেষ্টা করতে লাগলে—কিন্তু ওর দুরদৃষ্ট।

বিকালের দিকে অভয় এসে অকস্মাৎ চীৎকার করে বললো, —নবাবকন্যে! এখনও তোমার চা-খাবার হোল না? সকাল থেকে বলে রেখেছি, সন্ধ্যার আগেই আমায় বেরুতে হবে।

—সন্ধ্যের এখনো অনেক দেরী আছে!—তার আগেই হবে।

সেই মাত্র বৌটা চুলগুলো বেঁধে নেবার জন্য চিরুণী চালাতে বসেছে। মুখময় ঘামের ক্লান্তি ওর—হাতে গায়ে রান্নার হলুদ তেল লেগে রয়েছে। চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে ও হয়তো একটুখানি জিরিয়ে নেবে, কিন্তু ওর প্রতিবাদ সহ্য হোল না অভয়ের। রেগে লাথি মেরে তেলের শিশিটা ফেলে দিয়ে বলল, —ওঠ্ বল্‌ছি হারামজাদী! চুল বেঁধে বাইজী সাজ্‌তে লজ্জা করে না?

টেনে হিঁচড়ে তুলে দিল ওকে! এরকম কাণ্ড আরো অনেকবার হয়েছে, কিন্তু আজ যেন একটা বিপর্য্যয় ঘটলো মেয়েটার মনের গহনে। ওর সহিষ্ণুতার শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল যেন। দৃপ্ত কণ্ঠে বললো সে—বাইজী না সাজলে যে ইন্‌শ্‌পেক্টার দোকান তুলে দেবে। কালোবাজার চলবে কি করে? তোমার বাইজীরা খাবে কি?

রাগে অভয়ের সারা মুখচোখ বিভৎস হয়ে উঠলো, কিন্তু আশ্চর্য্য শক্তিতে নিজকে দমন করলো সে-নইলে আজ একটা খুনোখুনীই হয়ে যেত। বৌটাও যেন বুঝেছে তার কথার গুরুত্ব, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে সে রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে। অভয় নিজকে সাম্‌লে শুধু বললো—ওঃ, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর—! ভালোরে ভাল!

—চুরি আমার জন্যে করে না কেউ—চুরি করা হয় রাজের বন্ধুদের জন্যে।

বউটা আবার বললো রান্নাঘরের ভেতর থেকে। অভয় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েই রয়ে গেল খানিক। অমন শান্ত সহিষ্ণু বৌটার মুখে আজ এই বিদ্রোহের বাণী অভয়কে মূক করে দিয়েছে যেন। কিছু আর না বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, কারণ—আর বেশী কথা বললে আজ হয়তো বউটা লোক জড় করে দেবে। যে গোপনতার আশ্রয়ে এতকাল অভয় তার অত্যাচার চালিয়ে আসছে, আজই সেটা নষ্ট করবার ইচ্ছে ওর নেই। অতি বুদ্ধিমান অভয় তফাতে চলে গেল রাগটা সামলাবার জন্য!

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ঘরে ফিরে অভয় দেখলো, বউ ঘরে তালা বন্ধ করে গা' ধুতে চলে গেছে। আজই প্রথম বিদ্রোহ করেছে বৌটা—এবং এমন তীক্ষ্ণ ভাবে সেটা প্রকাশ করেছে যে অভয়ের বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। গুম্‌ হয়ে খানিক বসে রইল উঠোনের আঙ্গিনায়। বাইরের ঘরে রোহিত এসে ডাক দিল—অভয় আছ হে?

—হ্যাঁ—যাই!

নিজকে ভদ্র এবং শান্ত করতে করতে অভয় এসে লাইব্রেরী-ঘরে বসাল রোহিতকে। নতুন কিছু বই কিনতে হবে, রোহিত তারই তালিকা করবে।

—খানকয়েক ধর্ম্মপুস্তক এবার আনাতে হবে রোহিত!—অভয় বললো।

—কি রকম ধর্ম্মপুস্তক? গীতা, উপনিষদ? রোহিত প্রশ্ন করলো!

—না, যাতে ঘর-সংসারের ধর্ম্মের কথা থাকে, মেয়েদের সতীত্বের কথা থাকে, স্বামীর উপর ভক্তি, সংসারে লক্ষ্মীশ্রী রাখা,—ব্রত, পূজা ইত্যাদির কথা।...

—ওঃ—রোহিত হাসলো একটু! অভয়ের বিদ্যে গ্রামের ইস্কুলের ক্লাস নাইন পর্য্যন্ত, কাজেই, বর্ত্তমান যুগচেতনার সঙ্গে তার পূর্ণ পরিচয় ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সে অর্থবান্, এবং নিজেকে সবজান্তারূপে প্রচার করার মত নির্লজ্জ, তাই তাকে সহ্য করে চলে ওর শিক্ষিত বন্ধুরা। রোহিতও সয়েই যেত, কিন্তু আজ তাকে তালিকা করতে হবে, এবং সেক্রেটারী হিসাবে অভয়কে তাতে সই দিতে হবে, তাই হেসে বললো,

—ওসব ধর্ম্ম পুরোণো হয়ে গেছে অভয়। বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম হচ্ছে মানবধর্ম্ম, দেশমাতৃকার পূজাই এখন আমাদের ধর্ম্ম হওয়া উচিত—নারী-পুরুষ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই এই এক ধর্ম্মের কথাই শোনাবো—আমাদিকে বাঁচতে হবে; মানুষের মত হয়ে বাঁচতে হবে—সমস্ত অত্যাচার অপমান থেকে মুক্ত হতে হবে আমাদের। আমাদের সর্ব্বাগ্রে হ'তে হবে স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী। তাই যে সব বইএ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র আছে, যে-বইএ গণচেতনার প্রবহমানতা রূপ পেয়েছে সেই বই-ই কিনতে হবে!

অভয় ওর কথার কিছুটা বুঝলো কিছুটা বুঝলো না—প্রতিবাদ করবার মত শক্তি বা বিদ্যা ওর কিছুই নাই, তাই আস্তে

আস্তে বললো—সে অবশ্য তুমি যেমন বুঝবে, কিনবে; আমি কয়েকখানা ব্রতকথা, লক্ষ্মীর পাঁচালী—সাবিত্রীর উপন্যাস—এই সব কিনতে বলছিলাম!

জলভেজা শাড়ীর সপ্‌সপ্‌ শব্দ শুনে রোহিত জানালা পানে চেয়ে দেখলো, অভয়ের বৌ উঠোনের উপর যাচ্ছে ঘরের দিকে; ও নিশ্চয় এই জানালার ওদিকে দাঁড়িয়ে শুনছিল এদের কথা। রোহিত ওদিকে মনোযোগ না দিয়ে অভয়কে বলল—টাকা কম, এখন ওসব বই থাক, খানকয়েক রাজনৈতিক চেতনামূলক উপন্যাস আর সমাজনীতি সম্বন্ধে কিছু ভাল বই আনিয়ে নিই। ওসব উপন্যাসের যুগ নাই আর এখন!

অভয় ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে চুপ করে রইল একটু, তারপর বললো—ওসব বই এরা বুঝতে পারে না হে রোহিত!

—বোঝাতে হবে। লাইব্রেরী করার একমাত্র উদ্দেশ্য, ওদের ভালো বই পড়তে শেখাতে হবে। সস্তা উপন্যাস পড়িয়ে সময় নষ্ট করবার জন্য এত কষ্ট করে লাইব্রেরী করছি না।

রোহিতের কণ্ঠস্বরটা গুরুগম্ভীর গুরুমশায়ের মত। অভয় আর কথা বলতে সাহস করলো না। একটু বসে থেকে উঠে যেতে যেতে বললো—আমায় একটু জেলেপাড়ায় যেতে হবে ভাই; তুমি লিষ্টটা করে রাখ—আমি ফিরে এসে দেখবো। অভয় উঠোন পার হয়ে ভেতরে গেল।

রোহিত শুনতে পাবে, এই আশঙ্কায় কোনো কথাই সে আর বললো না বৌকে, চুপচাপ বসলো গিয়ে একটা আসনে। বৌটাও কিছু না বলে চা—আর খাবার এগিয়ে দিল ওর সুমুখে। খেতে

খেতে অভয় যেন আর কাউকে বলছে, এমনি ভাবে বললো,—চা খাবার সময় বাড়ীতে অন্য লোক থাকলে তাকেও একবাটি দিতে হয়।

রান্নাঘর থেকে বৌ শুনলো ওর কথা। হাসি পাচ্ছে মেয়েটার। ঝগড়া করে আধঘণ্টার মধ্যে সব ভুলে আবার ভাব করতে অভয়ের যোড়া নেই। তবে এর আগে বৌ কোনদিন প্রতিবাদ করেনি, তাই ভেবেছিল, আজ হয়তো অভয় কিছু বেশী কেলেঙ্কারী করবে। কথার কোনো উত্তর না দিয়ে রোহিতের জন্য সে চা, খাবার সাজাচ্ছে।

—আলোর অভাবে রোহিতের লিখতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই—না হে রোহিত্ ?

রোহিত কিন্তু এতখানা তফাৎ থেকে ওর কথা শুনতে পেল না, জবাবও দিল না। বৌটাই চা-খাবার নিয়ে এগিয়ে গেল লাইব্রেরী ঘরের দিকে! এদিক দিয়েও একটি দরজা আছে ওঘরে ঢুকবার—তাছাড়া একটা ছোট জানালাও আছে, ঘরের উঠানটা বেশ দেখা যায়। কিন্তু রোহিত আধো অন্ধকার ঘরটায় তক্তপোষে বসে লিখছিল, বৌটার ঢোকা টের পেল না। ওর সামনে চায়ের বাটি—আর খাবারের থালাটা এগিয়ে দিয়ে খুব ছোট্ট করে বললো—খান্!

এইমাত্র গা ধুয়ে এসেছে—জলধোয়া যৌবনের তরঙ্গে ওর মার্জ্জনের দীপ্তি! অঙ্গের সুরভি ওকে বেষ্টন করে রয়েছে প্রস্ফুট ফুলের মত। রোহিত চোখ তুলে দেখলো, কিন্তু ওর মস্তিষ্কে তখন বাংলার বড় বড় খ্যাতনামা লেখকদের বই-এর

নামগুলোই ঝলমল করছে—যে-কোনো নারীর রূপের দীপ্তি সেখানে নিষ্প্রভ! শূন্যদৃষ্টিতে চাইল রোহিত!

—খান!—ও আবার বললো এবং বলেই চলে গেল। ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। দিনের আলোশেষের কোমল অন্ধকারে যে-কোনো যুবকের চোখে ওকে হয়তো মায়াময়ী মনে হোত কিন্তু রোহিত সেই যে-কোনো যুবকদলের বাইরে। ওর আদর্শ এবং আত্মশক্তির ইস্পাৎ প্রণব চাটুজ্যের হাতে টেম্পার করা।

অভয় খেয়ে জুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় ঘরের বাইরে থেকেই রোহিতকে বলে গেল—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি আমি—তুমি থেকো যেন।

রোহিত কিছু উত্তর দেবার পূর্ব্বেই বৌ-এর উদ্দেশে ডাক দিয়ে বলল অভয়—লণ্ঠনটা দিয়ে যাও গো!—বেরিয়ে গেল অভয় রাস্তায়।

রোহিতের কাছে বৌটাকে এমন করে ছেড়ে দিয়ে গেল অভয়! ওর বিচিত্র মনের এ এক আশ্চর্য্য বিলাস। ও জানে, রোহিতের দ্বারা কোন নারীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া একান্তই অসম্ভব। রোহিত যদি কখনো কোনো মেয়েকে স্পর্শ করে, তবে তার আগে তাকে সাতপাকে বেঁধে তবে করবে—তার পূর্ব্বে নয়। রোহিতের হাতে তার বৌএর কিছুমাত্র অসম্মান হবে না। নারীর দৈহিক শুচিতাকেই অভয় একমাত্র শুচিতা বলে জেনে রেখেছে; তার

অন্তর যে অপর কোনো ব্যক্তির উপর আসক্তিতে আবিল হতে পারে—এটুকু বুঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধি ওর নেই।—অভয় নিশ্চিন্তে চলে গেল।

রোহিত দেখলো, ঘরখানা এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে আর লেখা চলে না। জানালাপথে চেয়ে দেখলো, অভয়ের বৌ তুলসী তলায় সন্ধ্যাদীপ দিয়ে প্রণাম করছে। খুব ভালো লাগে ওর এই প্রদীপ দেওয়া আর প্রণাম করা দেখতে। চেয়ে রইল। অভয়ের বৌ ঘরে গিয়েও প্রদীপ জ্বালালো, শাঁক বাজালো, তারপর বেরিয়ে এসে একটা লণ্ঠন জ্বাললো রান্না ঘরে ঢুকে। রোহিতকেই দিতে আসছে নিশ্চয় লণ্ঠনটা—কিন্তু দুতিন মিনিট ও এলো না। গেল কোথায় ?

আলোটা পেলে রোহিত তালিকাটা শেষ করে ফেলতে পারে। উঠোনের পানে চেয়ে দেখলো, শূন্য-উঠান, একদিকে শুধু প্রদীপটা জ্বলছে। বিরক্ত হচ্ছে রোহিত ক্রমশঃ—ভাবছে, উঠে চলে যাবে, ঠিক সেই সময় আলো হাতে এসে দাঁড়ালো বৌটা—মুখে চমৎকার হাসি, চোখে ইসারা ! কিন্তু রোহিত ওর অর্থ জানে না। এ বিষয়ে অতবড় বোকা পৃথিবীতে কমই আছে। পুস্তকের তালিকা শেষ করবার জন্য সে কাগজকলম তুলে নিল।

—কাল যা ধাক্কাটা দিয়েছিলেন, উঃ, এখনো ব্যথা করছে ! বৌটা বললে !

—ধাক্কা ! আমি ? কাকে ?—রোহিতের হাত থেকে কলমটা পড়ে যায় আর কি !

—আমাকেই গো মশাই! ভয় নেই, কাকাকে বলে দেব না—হাসছে বৌটা!

বিস্ময়ের আতিশয্যে কিম্বা ভয়ের আড়ষ্টতায় রোহিতের গায়ের রক্তটা শীতল হয়ে আসছে। বলে কি মেয়েটা! রোহিত কখন তাকে ধাক্কা দিতে গেল! রোহিত আস্তে বলল,— আপনি ভুল করছেন; আমি নই! আমি.........

—আচ্ছা, আচ্ছা, ভুলই হয়েছে। আপনি নন, আর কেউ হবে—মেয়েটা আশ্চর্য্যরকম ত্বরিতে সামলে নিল।

রোহিতের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে, কিন্তু ও আবার বললো হেসে হেসে,—দিলেই বা কি হোত! ধাক্কা তো কেউ আর ইচ্ছে ক'রে দেয় না......কি লিখছেন?

—কতকগুলো বই কিনতে হবে, তারই তালিকা করছি!—রোহিত ভয়ে ভয়ে বললো।

ওর শুকনো মুখের দিকে চেয়ে মেয়েটা হেসে উঠলো আবার, কাছে সরে এসে বললো—অত ভয় কচ্ছেন কেন আপনি! আমি কি বাঘ নাকি?

—না—না, অভয় ঘরে নেই! আপনি এখন যান এখান থেকে।

—এটা আমার ঘর, আমি যাব কেন? যেতে হয়, আপনারই যাওয়া উচিৎ!

যাওয়াই উচিৎ কিন্তু যাওয়ার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে রোহিতের। মেয়েটা ইতিমধ্যে রোহিতের চা-খাওয়া এঁটো বাসন গুলো গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল। ওর মুখের ভাবটা রোহিত

দেখতে পেল না, দেখলে বুঝতে পারতো,—সে-মুখে হাসির আড়ালে একটা তীব্র ঘৃণার ছুরিকা ঝক্‌মক্ করছে ; শুধু ঘৃণা নয়, পুরুষের পৌরুষের উপর অবজ্ঞা !

রোহিত নিঃশব্দে বসে রইল কিছুক্ষণ, ওদিকে কূয়োতলায় গিয়ে বৌটা সশব্দে বাসনগুলো ধুতে আরম্ভ করেছে। রাকার কাছে সে শুনেছিল, লোকটা খুব বীর, খুবই সাহসী—এই কি তার নমুনা নাকি। ছিঃ! কিন্তু ধাক্কাটা কেন দিল কাল ? ও দেয় নি,—না, ও নিশ্চয় ছিল না। বৌটার মনে পড়ে গেল, ধাক্কা লাগার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সে রাকাদের বাড়ীর ভাঙ্গা প্রাচীরের পাশ দিয়ে আসবার সময় রোহিতের কণ্ঠস্বর শুনেছিল। রোহিতের কণ্ঠস্বর অবশ্য খুব বেশি চেনা নেই ওর, কিন্তু রোহিতের কথা বলার ভঙ্গীটা ও কয়েকবারই শুনেছে, এমন কি আজও সন্ধ্যায় শুনলো। কাল ওখানে রাকাদের বাড়ীতে সে বলছিল—মনে পড়লো মেয়েটার—'নিজের মা, দেশের মা, আর জগতের মা এক !'

ধাক্কাটা তাহলে আর কেউ দিয়েছিল—কে সে ? আর কে আছে এ গাঁয়ে যাকে ও চেনে না ! সে যেই হোক, ওর কিছু এসে যায় না। ধাক্কাটা রোহিতের দেওয়া হলে ও খুসী হতে পারতো—এবং সেই প্রত্যাশাতেই ও গত কাল থেকে এ পর্য্যন্ত মনে মনে একটি জাগ্রত স্বপ্ন লালন করছিল—সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

বাসনগুলো ঘরে তুলে রেখে ও আবার বেরিয়ে এল উঠোনে। চাঁদনীরাত—আমগাছের পাতাগুলো চিকচিক করছে—আর

বনমল্লিকা লতাটায় কুঁড়ি এসেছে অজস্র—থোকা থোকা কুঁড়িগুলো। একটা থোকা ছিঁড়ে সে কবরীতে গুঁজলো তারপর এগিয়ে এল লাইব্রেরী ঘরটার জানালার কাছে!

—শুনছেন? আমার জন্য একখানা বই আনিয়ে দিতে হবে—দেবেন তো?

—কি বই?—রোহিত মুখ না তুলেই বললো। মেয়েটা একসেকেণ্ড থেমে বলল,

—ঐ যে, নিজের মা, দেশের আর জগতের মা'কে সেবা করার কথা থাকে, সেই বই।

—সে রকম বই অনেক আনাচ্ছি এবার—রোহিত যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলো!

—ও তো আপনাদের লাইব্রেরীর—ওসব আমাকে পড়তে দেয় না!

—কেন?—রোহিত অতিশয় ব্যথিত হয়ে মুখ তুললো!

—কেন—তা ওকেই শুধুবেন—হাসলো মেয়েটা আবার—বলে, ওসব নাকি কেচ্ছার বই!

—কেচ্ছার বই!

—হ্যাঁ, বুঝলেন না, নিজে যে কেচ্ছা করে, সে সবকিছুতেই কেচ্ছা দেখে—হিঃ হিঃ হিঃ!

হাসছে! রোহিতের ইচ্ছা হোল, সে শুধুবে যে অভয় কিরকম ধরণের কেচ্ছা করে, কিন্তু শুধুতে ওর সাহস হচ্ছে না।

এ মেয়েটির সঙ্গে আর বেশী ঘনিষ্ঠ হতে ভয় পাচ্ছে রোহিত।

—আমার জন্য একখানা ভাল আনিয়ে দিন—ওকে লুকিয়ে—আমি দাম দেব।

চলে গেল। স্বামীকে লুকিয়ে বই কিনতে চায়! কেন? বই তো কিছু খারাপ জিনিষ নয়। স্বামীরা আপত্তি করে কেন? —রোহিত বুঝতে পারছে না। নারী-মনের সূক্ষ্ম জটিলতা সম্বন্ধে রোহিত এত বেশী অজ্ঞ যে ওর মত সুশিক্ষিত যুবকের কাছে সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু ও সত্যি অজ্ঞ! কেন যে ওই মেয়েটা চলে গিয়ে আবার তার কাছে বই কেনবার আবেদন নিয়ে ফিরে এলো—এ রহস্যের কিনারা ওর বয়সের অন্য যে কোনো যুবক করতে পারতো, ও পারলো না! পারলো না, কারণ ওর জীবনের সমস্ত শিক্ষার মূলে আছে মা আর দেশমা-র জন্য উগ্র বেদনাবোধ! এর বেশী ও আর কিছু শেখেনি, শিখতেও চায় নি! কিন্তু প্রাকৃতিক গতি—যাকে বলে 'ইন্‌ষ্টিংট্'—সেটা ওরও আছে। অবোধ সেই 'ইন্‌ষ্টিংট্' ওর অন্তরটাকে আলোড়িত করে দিল—অন্ধ শক্তিতে নাড়িয়ে দিল। আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে রোহিতের মনে! অভয় ফিরে এলে ও বেঁচে যায় যেন। যদি আবার ঐ মেয়েটা ফিরে এসে কিছু বলে রোহিতকে? কিন্তু কোনো খারাপ কথা তো সে বলে নি? কেন এত ভয় করছে রোহিত! রোহিত আবার কাগজকলম তুলে নিল। লিখছে—শরৎ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পথের দাবী," রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' 'চার অধ্যায়'...

ঝন্ ঝন্ করে শব্দ উঠলো ঘরের দিকে একটা। কি যেন ভাঙলো মেয়েটা। রোহিত মুখ তুলে চাইলো জানালা পানে—

রান্নাঘরের সামনে পা-পিছ্‌লে পড়ে গেছে অভয়ের বৌ, হাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে থালা ছিল একখানা। লণ্ঠনটা ওর হাতের মধ্যে ধরা, জ্বলছে কিন্তু থালাটা ছিটকে গড়িয়ে পড়েছে উঠোনে। কাঁসার থালা—ভেঙেই গেছে হয়তো—কিন্তু বৌটার হাত-পাও তো ভাঙতে পারে। রোহিত যাবে নাকি উঠে ওকে তুলবার জন্য। কিন্তু যেরকম অসম্বৃত হয়ে পড়ে গেছে—ইস্‌—কাপড় চোপড় একেবারে ঠিক নেই—কাদায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে গা ওর! রোহিত উঠেই পড়েছিল ওকে তুলতে যাবার জন্য, কিন্তু তার বেরোবার পূর্ব্বেই ও নিজেই উঠে কাপড়-চোপড় ঝেড়েঝুড়ে পরলো;—ওর যৌবনের প্রগাঢ় পরিচয়গুলো বারম্বার ঝলকে উঠতে লাগলো রোহিতের চোখের উপর। রোহিত নিঃশব্দে বসে পড়লো আবার তার তক্তপোষে।

অভয়টা গেল কোথায়? আচ্ছা তো লোক! এমন করে একলাঘরে রোহিতকে বসিয়ে রেখে সে এত বেশিক্ষণের জন্য বাইরে যায় কেন? রোহিত চলে যাবে কি না, ভাবছে—বৌটা কূয়োর জল তুলে হাত-পা-গা ধুলো।

—খুব লেগেছে নাকি!—রোহিত প্রশ্নটা করে ফেললো নিজের অজ্ঞান্তেই।

—লাগলেই বা করছি কি? কেউ তো ধরবার নেই! গম্ভীর গলায় বললো বৌটা।

ধরবার একজন ছিল, সে রোহিত। কিন্তু সে তো ধরতে যায়নি। ওর অনুযোগের উত্তরে কি বললে ঠিক বলা হয়, জানা নেই রোহিতের। বললে,—একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়

—হয় বৈ কি! কারো গায়ে ধাক্কা দেবার সময়ও সেটা মনে রাখতে হয়।

ঘরে গিয়ে ঢুকলো মেয়েটা কাপড় ছাড়বার জন্য হয়তো। কিন্তু আবার সেই ধাক্কার অভিযোগ, এবং আসামী রোহিতই! তাহলে ওর নিশ্চয় ধারণা, ধাক্কাটা রোহিতই দিয়েছে, কিন্তু সে তো দেয় নি! নির্ব্বোধ রোহিত ব্যাকুলভাবে নিজকে কলঙ্ক-মুক্ত করবার কথা ভাবছে, ওদিকে মেয়েটা ঘরের ভেতর ঢুকে হাসতে লেগেছে। বেশ সুন্দর অভিনয়টা করেছে আজ—ভারী মজা লাগছে ওর রোহিতকে নিয়ে এই খেলা খেলতে! বাটনা-বাটা শিলের জল পড়ে পড়ে ঐ কাদাটুকু ভাগ্যিস হয়েছিল ওখানে—নইলে এমন করে আছাড়টা সে খেতে পারতো না। বোকা ঐ ছেলেটা নিশ্চয় বুঝতে পারে নি, যে আছাড়টা ওর ইচ্ছাকৃত। ওতে লাগবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ যাত্রার আসরে নির্ব্বাসন সংবাদ শুনে সীতা ঠিক এমনি করেই আছাড় খেয়েছিল—বেশ মনে আছে।

অভয় ফিরে এল, সঙ্গে আরেকজন। কে আবার এল! মেয়েটা মুখ তুলে দেখছে ভেতর থেকে। অভয় আর অম্বুজ লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকে রোহিতকে বলল,—অম্বুজ অনেক দিন পরে বাড়ী এসেছে হে রোহিত। ওকে ধরে নিয়ে এলাম। ওর নামটা আমাদের মেম্বারদের লিষ্টে লিখে নিতে হবে—কি বল?

—বেশ তো—হবে! রোহিত বললো। ওর যেন একটা নিদারুণ বিপদ কেটে গেছে অভয় ফেরায়—কিন্তু ধাক্কার অভি-যোগটার কথাই ও ভাবছে!

—তিন কাপ চা করে দাও, গো—অভয় বল্‌লো বৌ এর উদ্দেশে !

—চা আর আমি খাব না অভয় ! এই নাও বই-এর তালিকা। কাল সব মেম্বারদের ডেকে এপ্রুভ্‌ করিয়ে নিতে হবে, তারপর কালই আনতে দাও !

—কৈ দেখি লিষ্টখানা ! অম্বুজ নিল কাগজটা তুলে।

রোহিত চলে যাবার জন্য উঠছে। অভয় বললো—আরে বসো বসো ! আজ তো আর যাত্রা হচ্ছে না যে তাড়াতাড়ি আছে। অম্বুজেরও কিছু সাজেশন থাকতে পারে।

রোহিতকে টেনে আবার বসিয়ে দিয়ে অভয় গেল ঘরের দিকে। রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বললো—চা চাই তিন কাপ.

—পারবো না আমি বারবার চা করতে ! আছাড় খেয়ে অঙ্গ থেঁতলে গেল আমার !

—কখন আছাড় খেলে ! কোথায় ? অভয় ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে দেখতে গেল !

—থাক—কোথায় খেলাম, দেখতে হবে না—বলে ও চলে গেল পাশ কেটে ওঘরে।

মান-অভিমান বড় একটা করে না বৌ ; ও সয়েই এসেছে সব কিছু এতকাল ধরে। আজ ওর এই বৈচিত্রময়ী রূপ অভয়ের যেন ভাল লাগলো। যেন একটা পাথরের মূর্ত্তিতে প্রাণস্পন্দন জেগেছে। অভয় আদর করে বলল,—কৈ দেখি লক্ষীটি ! খুব লেগেছে ?

—হ্যাঁ, খুব—হেসে দিল বৌটা ! ভারী মজা লাগছে ওর এই রকম করতে !

অভয় ওকে ধরে বুকের কাছে তুলে পিঠ-পা-কোমর পরীক্ষা করলো, কিন্তু কোথাও কোনো দাগ নেই। কোথায় লেগেছে তাহলে! বললো,—যাঃ! মিছে কথা!

—হুঁ—মিছে কথা! ঐ দেখো কাপড়ের অবস্থা, আর ঐ থালাটা তো ভেঙেই গেছে!

সত্যি ভেঙে গেছে থালাটা, আর ছাড়া কাপড়টাতেও কাদা ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে। অন্য সময় থালা ভাঙলে অভয় হয়তো মার দিত ওকে। আজ কিন্তু মনটা যেন বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছে, বললো—থালা যাকগে। তোমার খুব লাগেনি তো? চুণ-হলুদ লাগিয়ে দাও না হয়।

—থামো, তোমার বন্ধুদের জন্যে চা করতেই যে দিন বয়ে যায়। যত সব জোটাচ্ছ দিন দিন!—সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই বন্ধু, আর ইন্‌সপেক্টার, আর……

কথাটা শেষ না করেই রান্নাঘরে ঢুকলো এসে। অভয় জামা খুলতে খুলতে দেখলো, চায়ের জল চড়াচ্ছে বৌটা। অভয় বেশ খুসী হয়েছে। খুসীর কারণ অনেক, আর প্রধানটা হচ্ছে, এই মাত্র মণ দশ চিনি আর—পঁচিশ টিন কেরোসীন তেল সে কালোবাজারে বেচে এল। আর রথু ঝানির সোমত্ত মেয়ে লুটনীর সঙ্গে কয়েকটা কথাও কইতে পেয়েছে। অভয় লাইব্রেরী ঘরে এল ফিরে।

লাইব্রেরী ঘরে রোহিত আর অম্বুজ কথা বলছে। অভয় এসে শুনতে লাগলো। দামী একটা সিগারেট বের করে দিল অম্বুজকে। রোহিত সিগারেট খায় না। অম্বুজ বলল,

—রাজনৈতিক সাহিত্য অবশ্য খুবই ভাল জিনিষ, কিন্তু এখানকার লোক বুঝবে না!

—আমিও তাই বলছিলাম অম্বুজ—অভয় কথাটা লুফে নিল যেন—আমিও এই কথাই বলছিলাম রোহিতকে যে কিছু 'পতি পরম গুরু' ক্লাসের বই আর কিছু খুনজখমের ডিক্টেটিভ বই আনানো দরকার। না হলে চাঁদা দিতে চায় না লোক—বলে, ওসব বই তারা বুঝতে পারে না। লক্ষ্মীর পাঁচালী, মেয়েদের ব্রতকথা, আশাবতীর উপাখ্যান, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা,....এই সব বই খুবই চায় এখানকার লোক।

দুইশত বৎসরের ইংরাজ রাজত্বের শিক্ষার উন্নতি। রোহিত নিঃশব্দে শুনছিল; অম্বুজ সমর্থন করলো অভয়ের কথাটা, বললো—সে তো ঠিকই। এখানকার লোক রাজনীতির কি বুঝবে! সমাজনীতির বা সাম্যবাদেরই বা কি বুঝবে! ওরা চায় সোজা গল্প, প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-মিলন।......

তিন বাটি চা নিয়ে ঢুকলো অভয়ের বৌ। আড়চে ভাবে একটু ঘোমটা—বাঁ গালটা ঢাকা, কিন্তু ডান গাল, গলা, কানের দুল, চুলের খোঁপার কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। অম্বুজের 'মিলন' কথাটায় যেন তাল দিয়ে গৃহ প্রবেশ করলো সে। অম্বুজ থেমে গেল। অভয় বলল,

—আনো!—এই আমার গৃহলক্ষ্মী অম্বুজ!—অভয় হাসিমুখে বলল অম্বুজকে!

—বাঃ! বেশ বৌ হয়েছে তো!—অম্বুজ প্রশংসা করলো। বৌটাও চায়ের বাটিগুলো নামিয়ে অম্বুজকে প্রণাম করলো।

অম্বুজ তাড়াতাড়ি সরে বলল,—আচ্ছা, থাক্-থাক্—খুব হয়েছে! সুখী হও!

অতি সামান্য হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো বৌটার ঠোঁটে—তারপর সে চলে গেল বাইরে। অম্বুজ একবাটি চা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলল,

—বেশ সুন্দরী বৌ হয়েছে। নামটি কি অভয়?

ওর নামটা যে জানা উচিৎ, এ তত্ত্ব রোহিতের জানা ছিল না! কিন্তু অম্বুজ জানে সে তত্ত্ব। কোনো রূপসী মেয়েকে দেখলেই তার নাম জানবার জন্য ওর আগ্রহ কারো থেকে কম নয়। অভয় সগর্ব্বে বলল,—কাঞ্চনমালা!

—চমৎকার নাম।—অম্বুজ বললো।—চা'টাও ভারী সুন্দর হয়েছে। হাতের গুণ আছে অভয়।

রোহিত চা খাচ্ছে না—অভয় দ্বিতীয় বার অনুরোধ করলো, অম্বুজও বলল,

—সত্যি চমৎকার হয়েছে চা, খেয়ে দেখ রোহিত!—তোমার বৌ লেখাপড়া কেমন জানে অভয়? আমাদের লাইব্রেরীর ম্যানেজিং কমিটিতে ওকে মেম্বার করে নাও—অম্বুজ বলল।

—লেখা-পড়া কিছুই জানে না—সামান্য প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়েছে।

মিথ্যে কথা বলছে অভয়। উঠোনের অন্ধকারে আড়ি পেতে থাকা বৌটার চোখ জ্বালা করে উঠলো! অম্বুজ বললো—তা হোক, তবুও ওকে মেম্বার করে নেওয়া হোক। ডাক তো, এই লিষ্টখানা ওকে শোনানো যাক!

—আরে দূর! ও লিষ্টের ও কি বুঝবে? ওসব বই-এর নামই শোনে নি কখনো! তা ছাড়া ওর মেম্বার হবার সময় কোথায়? ঘরের কাজ করবে কে?

ফের মিছে কথা! বই এর নাম বিস্তর শুনেছে ও, আর ঘরের কাজ করে অনন্ত সময় ওর পড়ে থাকে। কিন্তু ও জানে যে অভয় তাকে কোনো দিন ওদের লাইব্রেরীতে যেতে দেবে না। তার খেলা ঐ চা পরিবেশন পর্য্যন্তই। এর বেশি এগুতে গেলে বৌকে ঠেঙিয়ে অভয় দুরস্ত করে দেবে! তবু ওরা কি বলে শোনবার জন্য ও উঠোনের আমতলার আঁধারে দাঁড়িয়ে রইলো।

অম্বুজ বলল;—মেয়েদের অমনি করে আটকে রাখার জন্যই তো এই জাতটা এগুচ্ছে না! এই অবরোধ-প্রথাকে ধ্বংস না করলে কিছুই হবে না। নারীকে সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে...ইত্যাদি বহু পুরাতন বাঁধা বুলি সে বলে গেল অনেকটা। রোহিত অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছে। উঠে বললো—আমি এখন যাচ্ছি অভয়। এ লিষ্টের উপর আরো যদি কিছু তোমাদের 'সাজেশ্‌শন' থাকে তো লিখে রেখো!

ও বেরিয়ে গেল, কিন্তু যাবার সময় জানালা পথে হঠাৎ নজর পড়ায় দেখতে পেল, বৌটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে এই ঘরটারই দিকে? কেন। কি ও শুনছে?

বোনের সঙ্গে বিরোধটা বেশ এগিয়ে গেছে সত্যভামার। আজ সকালে সে তাকে নিয়ে অম্বুজদের বাড়ী যেতে চাইল, রুক্মিণী

শরীর খারাপ, বলে গেল না। অথচ শরীর তার কিছুমাত্র খারাপ নয়, কারণ নটার সময় সে রাকাদের বাড়ী গিয়ে ফিরে এল খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা দুটোয়; অথচ রাকার মা তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় নি। সত্যভামা শাশুড়ীকে বললো যে তার বোনের এটা খুবই অন্যায়, এই বিনা নিমন্ত্রণে খেতে যাওয়া। কিন্তু শাশুড়ী একেবারে ওপথে না গিয়েই বললেন যে প্রণব চাটুজ্যের বাড়ী কেউ নিমন্ত্রণ খেতে যায় না, প্রসাদ নিতে যায়। রুক্মিণীর এতে কোন দোষ হয় নি! প্রণব ঠাকুরপো তো মানুষ নন, দেবতা! রুক্মিণীকে তিনি নিজে খেয়ে যেতে বলেছেন, এ তার ভাগ্য! নিরুপায় হয়ে সত্যভামা চুপ করে গেল তখনকার মতন কিন্তু বিকেলবেলা আবার যখন বোনকে বললো, যে তার সঙ্গে যেতে হবে অম্বুজ ঠাকুরপোদের বাড়ী, তখন রুক্মিণী রুখে বললো,

—যাবো না! বিনা নিমন্ত্রণে কেন যেতে গেলাম তাদের বাড়ী?

—রাকাদের বাড়ী তো বেশ যেতে পার—সত্যভামাও রেগে বললো!

—হ্যাঁ যাব! যে-কদিন এখানে থাকবো, রাকাদের বাড়ী রোজ যাব—দু'বেলা।

বলেই রুক্মিণী চলে গেল—সত্যি গেল রাকাদের বাড়ীর দিকেই। রাগে সত্যভামার মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠছে কিন্তু ওর স্বামী ওকে সামলে দিলেন, বললেন—দু'দিনের জন্য এসেছে। ওর সঙ্গে অমন করে ঝগড়া বাধাচ্ছ কেন! থাকনা, যেখানে খুসী!

—রাকার সঙ্গে মিশে স্বদেশী হয়ে যাবে যে···দেখচো না কিরকম রোখ!

—স্বদেশী হওয়া অত সোজা নয় গো,—ও জিনিষ সবার ধাতে সয় না! সন্ন্যাসী হওয়া আর স্বদেশী হওয়ায় তফাৎ খুবই কম! ও বস্তু প্রণব চাটুজ্যের রক্তেই জন্মায়—তোমার রায়-বাহাদুর বাবার রক্তে নয়।

রাগে সত্যভামার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। ঝঙ্কার দিয়ে বলল,

—আমার বাবা না-হয় রায়বাহাদুর হতে চান, স্বদেশী করেন না; তোমার কোন্ অঙ্গের রক্তে স্বদেশীয়ানা আছে, শুনি!

—নাই! বললাম তো, প্রণব চাটুজ্যের রক্তেই ওটা জন্মায়। কিন্তু তুমি অত ভয় করছো কেন? এখন ইন্‌ট্রিম গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে, গণ-পরিষদ বসছে—এখন স্বদেশীয়ানাতে ভয়ের কিছু নেই! বরং আখেরে কিছু লাভ হতে পারে। আমিও ঠিক করেছি, এই মাসেই কংগ্রেস কিম্বা যা-হোক একটা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেব। ওটা না করলে পরে পস্তাতে হবে। তোমার বাবাকেও ঐ উপদেশ দাও। খেতাব-টেতাব পাবার আশা আর নেই। ইংরাজ বছরখানেকের মধ্যেই পাত্‌তাড়ি গুটোবে।···উনি কথাক'টা বলেই বাইরে চলে গেলেন!

সত্যভামা এত খবর জানতো না। রাজনৈতিক ব্যাপারের কোনো খবরই জানে না ও। বড়লোকের সংসার এবং বড় সংসার। একাই ওকে দেখতে হয় গরু দোয়া থেকে বিছানা পাতা পর্য্যন্ত। তারমধ্যে যেটুকু সময় পায়, শোবার ঘরে লুকিয়ে

বিদ্যাসুন্দর কিম্বা লণ্ডন-রহস্য পড়ে। খবরের কাগজ যদি পায় তো খোকার জন্য মোটা হবার ওষুদের বিজ্ঞাপন আর নিজের জন্য নতুন ডিজাইনের গয়নার ছবি দেখে! ইন্‌টিরিম বা গণ-পরিষদ ওর কাণে আজ পর্য্যন্ত ঢোকে নি।

ওর স্বামী তো ভয়ই করতো প্রণব চাটুজ্যের বংশকে। আজ আবার একি কথা বলে? ভূতের মুখে রামনাম নাকি? কিন্তু অত সব ভাববার ওর অবসর ছিল না। অম্বুজের সঙ্গে বোনের বিয়ের কথাটা পাকা করে যদি বাবার কিছু উপকার করতে পারে, এই আশায় খোকাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অম্বুজদের বাড়ী একটু তফাতে। ওরা কিছু দূরে গিয়ে নতুন দোতলা বাড়ী করেছেন বছর কয়েক হোল। বাড়ীটার ঢং একেবারে বাংলো ধরণের। সামনে বাগান, ফুলের গাছ, লতার মাচা-উঠানো সুদৃশ্য ফটক। এ ছাড়া অম্বুজের মা-বাবা-ভাইবোন সবাই খুব ভাল লোক! সত্যভামা ছেলে কোলে এসে ঢুকলো ফটকে। অম্বুজের ছোটবোন মিনি একছুটে এসে খোকাকে কোলে নিয়েই চেঁচিয়ে সকলকে জানিয়ে ছিল যে, বড়বৌদি এসেছে!

সত্যভামা এদের সকলেরই স্নেহপাত্রী—নিকট আত্মীয়া। শুধু বাড়ীটা দূর হয়ে গেছে বলে সব সময় আসা হয়ে ওঠে না। তাই সম্পর্কেও দূরত্ব ঘটে গেছে ইদানিং। অম্বুজের মা আদর করে ওকে ঘরে নিয়ে গেলেন, বসিয়ে বললেন—কি খবর বৌমা?

—ঠাকুরপো এসেছেন, কাল দেখলাম যাত্রার ওখানে। তাই দেখতে এলাম।

—হ্যাঁ—দুবছর পরে এল। ডাক তো মিনি তোর দাদাকে।

কিন্তু মিনি এসে জানালো যে দাদা বেরিয়ে গেছে। বড্ড নিরাশা হোল সত্যভামা, কিন্তু এসে যখন পড়েছে, তখন কথাটা তো সে ক'য়ে যেতে পারে। একটু ইতস্ততঃ করে বলে ফেললো,

—ঠাকুরপোর বিয়ের কিছু ব্যবস্থা করছেন জেঠিমা ?

—না মা, এখনো করি নি, তবে এবার করলেই হয়।

—আমি বাবাকে অম্বুজঠাকুরপোর কথা লিখেছিলাম, তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন……আমার ছোট বোন রুক্মিণী…

—ভারী সুন্দর মা……মিনি যেন নেচে উঠলো—লক্ষ্মীর মত চেহারা !

—তুই কোথায় দেখলি ?—ওর মা শুধুলেন।

—এসেছে এখানে। আমিই আনিয়েছি। দিনক্ষণ না দেখিয়ে আপনার ঘরে আনা ঠিক হবে না, ভেবে, সঙ্গে আনলাম না।

সত্যভামা বেশ কথা কইতে জানে। দিনক্ষণের দোহাই দিয়ে সে রুক্মিণীর না-আসার কারণটা প্রকাশ করলো। মিনি বললো—দেখলেই তোমার পছন্দ হবে মা, দাদারও হবে। ভারী সুন্দর !

—না এনে ভালই করেছ মা আজ। আজ বিষুদবারের বারবেলা। কাজেই আমি ভাল সময় দেখিয়ে ওকে আনবো নিজে গিয়ে। তোমার যখন বোন, তখন দেখবার আর কি আছে ! কতটা পড়েছে ?

—বি. এ পড়ছে। এই বছর পরীক্ষা দেবে।

—ওঃ, তাইতো মা, এতবেশী লেখাপড়া জানা মেয়ে…

—কিন্তু ঠাকুরপোর যোগ্য মেয়েই তো চাই জেঠাইমা! নেহাৎ কনে বৌ নিয়ে আজকালকার ছেলেরা ঘর করতে চায় না।

—হ্যাঁ মা, তা ঠিক কথা। আচ্ছা মা, আমি তোমার জেঠা-মশায়ের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করবো।

সত্যভামা মহানন্দে ফিরে এলো সন্ধ্যাবেলায়। বোনটাকে অম্বুজের সঙ্গে গাঁথতে পারলে বাবার বড্ড উপকার করা হয়। অম্বুজ খুবই ভাল ছেলে।

কিন্তু রুক্মিণী তখনো ফেরেনি রাকাদের বাড়ী থেকে। ঘরে ফিরে সত্যভামা সে খবর জেনে রাগে আর একবার ঠোঁট কামড়ালো—কিন্তু শাশুড়ী বললেন—অত রাগারাগি করছো কেন বৌমা! রাকার সঙ্গে ভাব হয়েছে তো ক্ষতি কি? একবয়সী মেয়ে, ওদের তো বন্ধুত্ব হবারই কথা!

—এক বয়সী মেয়ে এ গাঁয়ে আরো অনেক আছে মা, তাদের সঙ্গে ভাব করুক না!

—কিন্তু তোমার বোন বি. এ. পড়ছে, যার-তার সঙ্গে মিশতে পারবে কেন মা?

—মিশতে তো হবে! বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ীতে সবাই যে রাকার মতন বিদূষী হবে, তার তো কিছু ঠিক নেই! রুক্মিণীকে আপনি একটু ধমকে দিন মা।

—ওমা, সেকি কথা বলো বৌমা! আমার বাড়ী দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে, আমি কেন ধমক দিতে যাব? আর

অন্যায়টা কি এমন করেছে রুক্মিণী ? রাকার সঙ্গে ভাব করা তো ভালই কথা ! রাকা কি কিছু মন্দ মেয়ে ?

সত্যভামা নিরুপায় হয়ে গেল। স্বামী বা শাশুড়ী নিশ্চয় রুক্মিণীকে কিছুই বলবে না, কিন্তু সত্যভামা সত্যিই চায় না যে রুক্মিণী অমন করে রাকাদের বাড়ী গিয়ে বসে থাকবে। ওর সব থেকে বেশী ভয় রাকার বাবাকে। তিনি এমন সুন্দর আর সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলেন যে মানুষের মন অভিভূত না হয়ে পারে না। কিন্তু তাঁর সমস্ত কথার মধ্যে তীব্র দেশাত্মবোধ সব সময় জেগে থাকে। সব সময় তিনি শুধু ঐ একটি কথাই বলেন—"তোমাদের দীপ্ত যৌবন দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনুক !..."

রুক্মিণী আই-এ পড়বার সময় একবার ছাত্র-শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে লাঠী খায়—সত্যভামা সে খবর জানে। দ্বিতীয়বার—নেতাজী-দিবস পালন করতে গিয়ে একরাত্রি হাজত বাস করে, সে-কথাও জেনেছে সত্যভামা। বড়দা অনেক কষ্টে সেবার ওকে উদ্ধার করে এনেছিলেন—বেশ কিছু অর্থব্যয়ও হয়েছিল।—বর্ত্তমানে কলকাতায় নাকি স্বদেশী ব্যাপার নিয়ে নানা রকম আন্দোলন চলছে—জেল, হাজত, লাঠীচার্জ হরদম হচ্ছে—তাই বড়দা কৌশল করে বেড়াতে যাবার অছিলায় রুক্মিণীকে এই দূর পল্লীগ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রুক্মিণী কোনোরকম রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে—বাবা বা বড়দা এটা একেবারেই চান না। সত্যভামাও সেই জন্যই ওকে আনিয়েছিল। কিন্তু কে জানে, সরষের মধ্যে ভূত আজকাল বাসা বেঁধেছে ! সত্যভামা এই গ্রামের বৌ—স্বদেশী আন্দোলন এই দূর-পল্লীতে বিশেষ

ব্যাপ্তি লাভ কোনদিনই করেনি। তার বিয়ের বছর কিছু-কিঞ্চিৎ যা হয়েছিল—তার সব কিছুই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বহুদিন, শুধু ঠাণ্ডা হয়নি প্রৌঢ় প্রণব চাটুজ্যের ফুটন্ত রক্তটা। কিন্তু সত্যভামা জানতো, প্রণব চাটুজ্যের রক্ত ফুটন্ত হলেও একটা কুণ্ডের মধ্যে বন্দী—তার সক্রীয় প্রবহমানতা আছে বলে সত্যভামার জানা ছিল না। আজ ঐ বদ্ধ কুণ্ডের কাছে বহমান রোহিতকে দেখে সে এত বেশি সাবধান হচ্ছে।

রাত হয়ে গেল অনেকখানা—রুক্মিণী এখনো ফিরলো না। সত্যভামার চিন্তাও বেড়ে চলেছে। শেষে স্বামীকে বললো, —রুক্মিণীকে ডেকে আনো তুমি গিয়ে। সেই বিকেলবেলা গেছে, এখনো এলো না!

—ঝি-টাকে পাঠিয়ে দাও না—কিম্বা তুমিই গিয়ে ডেকে আন!

কিন্তু কাউকেই যেতে হোল না, স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল—রুক্মিণী আসছে। ওর সাদা শাড়ীর আঁচলাটা দূর থেকে পতাকার মত দেখাচ্ছে। সত্যভামা বোনকে তিরস্কার করবার জন্য কথায় শাণ দিতে লাগলো।

—এতক্ষণ ধ'রে কি গল্প তুই করলি রাকার সঙ্গে? বল আমায়, কিসের এত গল্প?

—তুমি যা ভাবছো, সেই স্বদেশীর গল্পই যদি করে থাকি তো তোমাকে সে পরিচয় দেবার মত মুখখু আর নেই আমি দিদি···, বলতে বলতে হাসলো রুক্মিণী।

—তোমাকে কালই আমি কলকাতা পাঠিয়ে দিচ্ছি!

—তুমি পাঠাতে পারবে না ; দাদা আর বাবা চক্রান্ত করে আমায় এখানে পাঠিয়েছে, সে-খবর আমি রাখি ! কিন্তু তুমি ভেবো না দিদি—আমি কিচ্ছু স্বদেশী করি নি !

—কি করছিলি ?

—শুনছিলাম, পলাশীর যুদ্ধের কথা—যে কথা ইতিহাসে লেখে না, সেইসব কথা—সিপাহী বিদ্রোহের কথা, তারপর উনিশ শ' পাঁচ সালের বিপ্লবীদের গুপ্ত ইতিহাস,—সে-ইতিহাস পৃথিবীর ভাষায় কোনোদিন হয়তো লেখা হবে না !

কথা বলতে বলতে রুক্মিণীর কণ্ঠস্বর এমন আবেগময় হয়ে উঠছিল যে সত্যভামা সত্যই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলো। রুক্মিণী বলে চললো,—শুনছিলাম শত সহস্র সহিদের মৃত্যুর অমর কাহিনী, মাতৃভূমির জন্য লক্ষ জীবনের প্রাণবলি—তার সঙ্গে শুনছিলাম ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলার অবিস্মরণীয় অবদান, অনমনীয় বীর্য্য, অপরাজেয় শক্তি, আর এই বাংলারই স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা আর তোমাদের মত ভীরু ধনাদুলালীদের আঁচল-ধ'রে-বসে-থাকা কাপুরুষ যৌবন শক্তির নির্লজ্জ ইতিহাস !

কথাগুলো প্রণব চাটুজ্যের বাড়ী থেকে টাট্‌কা আমদানী করা। সত্যভামা তার বিদূষী বোনের সঙ্গে তর্ক করতে ভয় করে এবং তর্ক করার শক্তিও তার নেই। সে শুধু বোনের কল্যাণই চায়, যে-কল্যাণ তার নিজের মনোগত আদর্শে সত্যকার কল্যাণ বলে সে জেনেছে। তাই আজ ওর কথা শুনে সত্যভামা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল এবং ঠিক করলো—দাদাকে অবিলম্বে

চিঠি লিখে রুক্মিণীকে এখান থেকে সরাতে হবে এবং অতি শীঘ্র অম্বুজ বা অন্য যারই সঙ্গে হোক, ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলতে হবে।

রুক্মিণী তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটাতে চলে এল সত্যভামাকে কথাগুলো বলতে বলতেই। দিদি কি উত্তর দেবে, শুনবার আগ্রহ ওর কিছুমাত্র ছিল না। একখানা চেয়ারে বসে সে নিজের মনেই আলোচনা করতে লাগলো আজ বিকালের কথা-গুলো। রাকা যে কতখানি অসাধারণ মেয়ে তা ও এই একটা বিকালের আলাপেই বুঝেছে—এমন কি, তার আগেও কিছুকিছু বুঝেছিল—কিন্তু রাকার বাবার আদর্শ যে কতখানি উত্তুঙ্গ তা সে এইমাত্র অনুভব করে এল। আসবার সময় প্রণব চাটুজ্যের পায়ে প্রণাম করে রুক্মিণী সলজ্জ প্রশ্ন নিবেদন করেছিল,—

—রাকার বিয়ে সম্বন্ধে আপনার কি অভিপ্রায়!

—কিছুমাত্র না। বিয়ের ব্যাপারে রাকা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাকে যথেষ্ট শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে লালন করা আমার কাজ, যথাসাধ্য তা করেছি। তার স্বাতন্ত্র্য, তার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, তার আত্ম-রক্ষার শক্তি যতদূর সম্ভব জাগ্রত করে দিয়েছি। এখন সে স্বেচ্ছায় তার জীবনের পথ বেছে নেবে। আমার অনুমোদন চায় তো আমার যথাজ্ঞান তাকে উপদেশ দেব। আর্থিক প্রয়োজনও যথাসাধ্য মিটাতে হবে আমায়, যদি তার দরকার হয়! ওর স্বাধীন মত আমি কোথাও খর্ব্ব করবো না!

রুক্মিণী অবাক হয়ে ভেবেচে—এই দূর পল্লীতে, যেখানে সমাজের ভ্রূকুটি সকলসময় মানুষকে সন্ত্রস্ত রাখে সেইখানেই এক-জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার প্রাপ্তযৌবনা অনূঢ়া কন্যা সম্বন্ধে এতখানি

ঔদার্য্য কিরূপে দেখাতে পারে! ওঁর কথাটাকে যাচাই করবার জন্য রুক্মিণী আবার প্রশ্ন করলো,

—বিয়ে করা তো মানুষের ধর্ম্ম!

—বিয়ে করা জীবধর্ম্ম। জীবস্রোত বহমান রাখবার জন্য প্রকৃতির এই ধর্ম্ম! মানুষও জীব, কিন্তু মানবধর্ম্মে সে নিজেকে জৈবভূমি থেকে উন্নত স্তরে আনবার সাধনা করে। তাই তার বিবাহে এত বিধি, এত নিষেধ, এত নিয়ম-শৃঙ্খলা। যে মানুষ জৈব-ধর্ম্ম থেকে মুক্ত, তার বিয়ের প্রয়োজন না হতে পারে মা—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কৌমার্য্যদীপ্ত মানবচরিত্রের অভাব নেই।

—রাকাকে আপনি আজীবন কুমারী থাকতে দেবেন?

—আমি কেন দেব মা! রাকার ইচ্ছা হ'লে থাকবে। না হ'লে থাকবে না।

রুক্মিণী ঐ কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ফিরে এলো—এসেই বোনের সঙ্গে কথা, কিন্তু ওর মনটা তখন উচ্চ সুরে বাঁধা ছিল। তাই সত্যভামার কথার আভ্যন্তরীন্ অর্থ সে ধরতে চায় নি! রাকাদের বাড়ীর কথাগুলোই ভাবছিল। সত্যভামা খেতে ডাকতে এল! দিদির মুখের ভাবটা বেশ কঠোর। রুক্মিণী হেসে বললো—রাগ করো না দিদি, রাকার বাবার কাছে আমি ধর্ম্মকথা শুনছিলাম।

—আচ্ছা—সত্যভামা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলল—আয়, খেতে আয় এখন।

—কাল তোমার সঙ্গে যাব,—সেই অম্বুজ, না গম্বুজ কি যেন, তাদের বাড়ী।—হাসলো।

সত্যভামা আরো রেগে উঠলো, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো—মানুষের নাম নিয়ে ঠাট্টা করতে লজ্জা করে না তোর? এই লেখাপড়া শিখছিস!

—সেকি দিদি? ঠাট্টা করলাম, না, তাকে সম্মান দেখালাম? আচ্ছা, জামাইবাবু, আপনিই বলুন তো—রুক্মিণী বারান্দায় দাঁড়ানো ভগ্নিপতিকে শালিসি মানলো—অম্বুজ তো জলে হাবুডুবু খায়, আর গম্বুজ উন্নত মাথা তুলে আকাশে ওঠে সগর্ব্বে! অম্বুজকে গম্বুজ বললে সম্মান করা হয় কিনা বলুন।

—যার যা নাম, তাকে তাই বলাই উচিৎ—সত্যভামাই জবাব দিল রুক্মিণীকে।

—তাহলে ওর নাম অম্বুজ না হয়ে গম্বুজ কিম্বা কম্বোডিয়া হলে ভাল হোত।

রুক্মিণী হাসতে লাগলো সত্যভামার রাগ দেখে। জামাইবাবুও তরুণী শ্যালীকার হাসিতে যোগ দিয়ে বললেন—রাগছো কেন? এসো, খেতে দাও!

সত্যভামা গম্ভীর বিরক্ত মুখেই খাবার দিচ্ছে ওদের, জামাইবাবু বললেন—তা অম্বুজ ছেলেটি বেশ, তুই দেখিস রুক্মিণী, বিজ্ঞান-জগতে ও একটা গম্বুজই হয়ে উঠবে। আমাদের স্বাধীন ভারতে বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন হবে সব থেকে বেশী। তখন ওদের ডাক পড়বে দেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপরিষদে!

—আপনি বিষয়ী আর হিসেবী জামাইবাবু, তাই বেশ হিসাব করে ভেবেচিন্তে দেখেছেন,—আজ যারা ডিমের ভেতর রয়েছে, একদিন ছানা বেরুলে তারা কাকাতুয়া হবে, তারপর বুলি বলতে

শিখবে, তখন তার দামও হবে হাজার টাকা! কিন্তু যৌবনের জাগ্রত শক্তি অত হিসাব করে তো কাজ করতে চায় না,—রুক্মিণী একটুক্ষণ থামলো—তারপর আবার আরম্ভ করলো,

—এতকাল ইংরাজের তোষামুদী করে আপনারা বেশ ছিলেন; আজ যেই দেখলেন, ইংরাজ পাত্‌তাড়ী গুটোচ্ছে, কংগ্রেস জাতীয় সরকার গঠন করছে, অমনি আপনাদের সুর ফিরে গেল। আপনাদের দোলের মেলাতেও তাই অমনি একটা তিনরং পতাকা তুলে দেওয়া হোল। এই স্বার্থবুদ্ধিই এই হতভাগা দেশটাকে এতখানা হতভাগা করেছে জামাইবাবু! আজ আপনিই কংগ্রেস-হিন্দুমহাসভার জয়গান করছেন, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে, গতবার যখন আপনি কলকাতা যান বছর দেড়েক আগে, তখনও বাবা আর দাদার সঙ্গে যোগ দিয়ে আপনি কি ভয়ঙ্কর রকমে আক্রমণ করেছিলেন দেশের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের! যারা এই দীর্ঘ দিনের কারাবরণ, লাঞ্ছনা, অপমৃত্যুর মধ্য দিয়ে আজ ইংরাজ-বিতাড়নের অমোঘ শক্তি সঞ্চয় করেছেন—তাঁদের কথা আপনারা একদিনও শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করেন নি! যেটুকু করেছেন, স্ব-স্বার্থের জন্য। আবার আজ যেটুকু করছেন, তাও স্ব-স্বার্থের জন্যই।

জামাইবাবু এই বিদুষী শ্যালিকাকে বেশী ঘাঁটাতে সাহস করছেন না। তথাপি বললেন—বেশ, মেনে নিলাম, আমরা স্বার্থান্বেষী। কিন্তু অম্বুজ বা তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা কি দোষ করলো?

—কারো দোষগুণের কথা বলছি না, বলছি আপনার বিষয়-

বুদ্ধির কথা। কাকাতুয়ার ডিম সংগ্রহ করে দাঁও মারবার কথা—রুক্মিণী রসিকতা করলো যেন।

জামাইবাবু শ্যালিকার রসিকতায় আহত হয়েও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না, কিন্তু একেবারে চুপ করে যাওয়াও তাঁর জমিদারী স্বভাবের বিরুদ্ধ।

—ডিমটি সংগ্রহ করে আমরা ভালো যায়গাতেই রাখতে চাইছি! অর্থাৎ তোর কাছে।—উনি বললেন।

—কিন্তু আমি একেবারে বুলিবলা কাকাতুয়াই পেতে চাই—ডিম নয়। ডিম পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে; তাছাড়া কে জানে, ডিমে কাকাতুয়া আছে, নাকি কাক আছে!

সত্যভামা চুপচাপ পরিবেশন করছিল, কোনো কথা বলেনি। এতক্ষণে ফাঁক পেয়ে বলল—কাক কি কাকাতুয়া, যাচাই করলেই তো হয়!

—দরকারটা কি দিদি? কাক বা কাকাতুয়া কোনোটারই প্রয়োজন দেখছি না। বাবা, দাদা বা দিদি-জামাইবাবু রঙিন একটা খেলনা যোগাড় করে দেবেন, আর আমি খেলতে লেগে যাবো—সেরকম বয়স পার হয়েছি আমি! তোমার যদি সে-মতলব থাকে তো ছেড়ে দাও, আর এগিও না।

সত্যভামা একেবারে চুপ হয়ে গেল এবং জামাইবাবুও। রুক্মিণীও আর কোনো কথা না বলে খেয়েই শোবার ঘরে ঢুকলো এসে। ওর বিরক্তি বোধ হচ্ছে। ঐ অম্বুজ না গম্বুজ, সে যে খুবই একখানা ভালো ছেলে এবং দামী হীরক, এই তথ্য দিদি আজ সারাদিন তাকে শুনিয়েছে। বিকালে তার সঙ্গে না যাওয়ার

জন্য রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়েছে দিদি।—কিন্তু ভালো হীরা-সংগ্রহের জন্য রুক্মিণী এখানে আসেনি। এই পল্লী-বনভূমিতে যদি কোন অপার্থিব পুষ্পের আকস্মিক আবিষ্কার ঘটে যায় তার ভাগ্যে, তবে সেইটাই রুক্মিণী সংগ্রহ করবে। হীরাজহরৎ কলকাতাতেও বিস্তর মেলে এবং রুক্মিণীর ধনী পিতার সেটা সংগ্রহ করতে সময় লাগবে না। কিন্তু রুক্মিণী তা চায় না।

কিন্তু কি চায় রুক্মিণী? শুয়ে শুয়ে রুক্মিণী ভাবতে লাগল। কি সে চায়? এই দীর্ঘ বিশ বছরের জীবনে কোনো আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ লক্ষ্য তো তার ছিল না। অন্য পাঁচজন মেয়ের মত সে নিজকে মার্জিত করেছে, শিক্ষিত করেছে, সভ্যতার আওতায় এনে এটিকেট-দুরস্থ করেছে, এবং মাঝে মাঝে কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে হুজুগে মেতে সখের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার মধ্যে নিষ্ঠা বা নিয়মানুবর্ত্তিতার চেয়ে হুজুগটাই ছিল বেশি। কিন্তু ঐ হুজুগপ্রিয়তার অন্তরালে যে তার অন্তরতলে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগছিল ধীরে ধীরে—সে খবর এই সবে কাল মাত্র জেনেছে রুক্মিণী। সে আকাঙ্ক্ষা ভারত-জননীর একনিষ্ঠা সেবিকা হবার আকাঙ্ক্ষা। আর সেই আদর্শ তার চোখের উপর ধ'রে দিয়েছেন প্রণব চাটুজ্যে,—ঐ আশ্চর্য্য মানুষটি!

রুক্মিণী বিছানায় উঠে বসে হাত তুলে নমস্কার করলো, প্রণব চাটুজ্যের উদ্দেশে। আপনার মনেই বললো,

—জীবনটাকে তোমার আদর্শেই দান করলাম—সে আদর্শ যেখানে পরিস্ফুর্ত্ত হবে, তুমিই সেখানে আমায় পৌঁছে দিও।

রুক্মিণী যেন বিশেষ তৃপ্তি লাভ করলো কথাকয়টি বলে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে গেল—নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে।

প্রণব চাটুজ্যের ব্যবহারিক জীবন দেখে বোঝাই যায় না যে তিনি ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ধারায় কোনোরকম ভাবে সক্রিয় হয়ে যুক্ত আছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পূজা-জপ-পাঠ নিয়েই যেন তিনি দিন কাটান, এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয় মানুষের মনে। কিন্তু দু'তিন দিন তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেই বোঝা যায়, উনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবেই যুক্ত আছেন, কিন্তু সে সক্রিয়তা কতখানি এবং কোন্ স্তরের তা বুঝতে যথেষ্ট সময় এবং ধৈর্য্য দরকার। অংশু, রোহিত এবং রাকা ছাড়া এখানকার কেউ তা জানে না। উনি জানাবার প্রয়োজনই অনুভব করেন না। উনি মাঝে মাঝে দশ-পাঁচ দিনের জন্য বাইরে চলে যান—কোথায় যান, কারো জানা থাকে না। সকলেই ভাবে, খবরের কাগজের অফিসে হয়ত প্রবন্ধের দরুণ টাকা আদায় করতে গেছেন, কিম্বা, মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে বেরিয়েছেন—কিম্বা—যার যা ইচ্ছা ভেবে নেয়। উনি একান্ত নির্লিপ্ত লোক এবং অত্যন্ত রাশভারী লোক বলে কেউ কোনো প্রশ্ন করতেও সাহস পায় না।

কিন্তু উনি যান মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে নয়, মাতা ভারতের মুক্তিযজ্ঞের সমিধ সংগ্রহের জন্যই। সে খবর বর্ত্তমান ভারতের বড়বড় রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ ভালোভাবেই অবগত আছেন, কিন্তু কস্মিন-

কালে ওঁর নাম খবরের কাগজের কোনো কোণাতেও মুদ্রিত হয় না! উনিই হতে দেন না। প্রচার-পারিপাট্যের মধ্যে নিজকে প্রকাণ্ড করে তোলবার মত সক্রিয়তা ওঁর নেই এবং উনি সেটা চানও না। ওঁর যে পূর্ব্বপুরুষ একদিন পলাশীর রণক্ষেত্রে নীরবে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, যাঁর কথা কোনো ইতিহাসে কখনো লেখা হয়নি—উনি তাঁরই বংশধর। সেই রক্তের আদর্শই ওঁর বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু রোহিত তর্ক তোলে অনেক সময়—বলে 'প্রচার দরকার।' অংশুও তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে—দেশের জন-সাধারণের কাছে নিজকে তুলে না ধরতে পারলে আপনাকে তারা চিনবে কি করে বাবা ?

—আমাকে চেনার তো দরকার নেই। আমি স্বাধীনতাযুদ্ধের সামান্য সৈনিক। সবাই যদি সেনাপতি হবার প্রতিযোগিতা করে, তাহলে যুদ্ধের সময় আদেশ দেবার লোক পাওয়া যাবে না; সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

—কিন্তু প্রধান সেনাপতির নীচে সহকারী-সেনাপতিদেরও তো দরকার,—রোহিত এবং অংশু তর্ক করতে চায়। তিনি হেসেই জবাব দেন,

—সহকারী এবং সহযোগীদের ভীড়ে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামক্ষেত্র মেছোহাটা হয়ে গেছে। আর ভীড় বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি তো কোনোরকম স্বার্থবুদ্ধি-প্রনোদিত হয়ে লীডার হতে চাইছি না—আমি চাই আমার মাতৃভূমির মুক্তি। সেই

মুক্তি-সংগ্রামে আমি নাম-না-জানা সৈনিক হয়েই থাকবো—কারণ, খ্যাতির বরমাল্য আমাকে আদর্শচ্যুত করতে পারে।

উনি দৃষ্টান্ত দেখান না, বলেন,—কাউকে নিন্দা করা আমার আদর্শের বিরুদ্ধে যায়। কার ভুলের জন্য আজ আমাদের এই শাস্তি, এই পরদাসত্ব, তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা পরে হবে, যখন তোমরা দেশের সত্যকার ইতিহাস লিখতে পারবে। আজ শুধু মুক্তিযুদ্ধে অগ্রগামী হও—সেনাপতির নির্দেশ পালন করে চল। তাঁর ভুলের জন্য যদি যুদ্ধে পরাজয়ও ঘটে, তোমার কাজ তুমি করেছ, এই তোমার সান্ত্বনা থাকবে।

কিন্তু অংশু এবং রোহিতের দৃপ্ত যৌবন ও কথা মানতে চায়নি। তাদের আদর্শনিষ্ঠা এবং পিতৃভক্তি ঐ যায়গাতেই আহত হয়েছিল, এবং সুযোগ মেলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা উভয়ে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছিল প্রণব চাটুজ্যের। শুধু রাকা যোগ দেয় নি। রাকা তার পিতার আদর্শেই একনিষ্ঠ আছে। আজও রাকা তার বাবাকেই অনুসরণ করে চলে। রাকা প্রণব চাটুজ্যের মানস-পুত্রী।

রোহিত মুক্তিলাভ করেই বাড়ী এলো মাকে দেখতে এবং প্রণব চাটুজ্যের কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করলো তার হঠকারিতার জন্য। কিন্তু অংশু আজো ফেরেনি! কে জানে, সে মুক্তি পেয়েছে কি না! অংশুর মা স্বামীকে প্রশ্ন করে উত্তর পান না—বোঝেন, স্বামী পুত্রের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। কিন্তু রোহিতের মুক্তির পর থেকে তিনি প্রত্যহ আশা করছেন, অংশু হয়তো আজই ফিরে আসবে। পুত্র-বিরহ মায়ের প্রাণকে দুর্ব্বল

করে তোলে। রাকাকে বলেন—তোর দাদার খবরটা পাসনি রাকা? সত্যি বল!

—মিথ্যে তো কখনো বলিনে মা—রাকা জবাব দেয়।

আজ অকস্মাৎ রাকা একখানা খবরের কাগজ হাতে ছুটে এল ওঁর কাছে—বললো,—মা, মা, দাদার খবর পেয়েছি!

মা দুপুরের সময় চোখবুজে সামান্য বিশ্রাম করছিলেন। ত্বরিতে উঠে বসে বললেন—কৈ? অংশু এলো! অংশু?

—না মা, আসেনি,—কাগজে খবর বেরিয়েছে! রাকা পেনসিলের দাগ দেওয়া একটা যায়গা দেখালো—লেখা রয়েছে: ভারত ও বৃহত্তর ভারত-সংস্কৃতি-সম্মিলন—

আগামী এপ্রিল মাসে যাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, চীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ইরান, তুরান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশ সমূহের সুযোগ্য প্রতিনিধিদের সমবায়ে ভারত ও বৃহত্তর ভারত-সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই মহা সম্মেলনে পৌরহিত্য করিবেন সদ্যকারামুক্ত পঞ্চতীর্থোপাধিক দেশরত্ন শ্রীমান অংশুমালী চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনের স্থান এখনো স্থির হয় নাই! আমরা এই মহাসম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

সংবাদটা পড়ে মা প্রায় মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন। তারপর শুধুলেন,

—তোর বাবা দেখেছেন এ খবর?

—হ্যাঁ মা, বাবাই তো এই পেনসিলের দাগটা দিয়েছেন!

—তাইতো!—মা অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন।

উনি ভাবছেন সংবাদটা অংশুর বাবার প্রীতিদায়ক হয়নি হয়তো, তাই তিনি অমন সুখবরের কথাটা বাড়ীর কাউকে জানানোও প্রয়োজন মনে করেন নি!

—তুমি ভেবো না মা; দাদা তার ভুল বুঝেছে। তাই এখন অন্য পথ ধরে দেশের কাজ করতে লেগেছে। আর এই জন্যই ছাড়া পেয়েও বাড়ী আসেনি! বাবা হয়তো এই প্রচার-কার্য্যটা ভাল চোখে দেখবেন না!

—তাহলে?

—আমি বাবাকে বলছি যে, এ সব কাজ প্রচার না করলে লোকে জানবে কি করে। এ তো রাজনীতির পলিসী নয়! তুমি ভেবো না!

মা চুপ করে রইলেন। পুত্র কারামুক্ত হয়েছে। এইটাই আজ সব থেকে বড়ো আনন্দ ওঁর কাছে, কিন্তু স্বামী যে ঐ সংবাদটা কি চোখে দেখেছেন, তা না জানা পর্য্যন্ত উনি স্বস্তি পাচ্ছেন না!

রাকা খবরটা রোহিতকে দেবার জন্য ছটফট্ করতে লাগলো। কিন্তু রোহিত এখন হয় তো তার বাড়ীতে ঘুমুচ্ছে। রাকা আজকাল যখন তখন বেরয় না; ওর মার নিষেধ। সে তাই বাবার ঘরে গিয়ে দেখলো—প্রণব চাটুজ্যে যেন ধ্যানমগ্ন।

বাবার এরকম অবস্থার কথা রাকা জানে। সে নীরবে বসে রইল একধারে। দেখতে লাগলো, বাবার সামনে মস্ত এক পুঁথী খোলা—জরাথুষ্ট্র রচিত আবেস্তা। এই প্রাচীনতম পুঁথীখানি নিয়ে পিতা যে স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয়

সংস্কৃতির সহিত বৃহত্তর ভারতের সংযোগ সন্ধান করছেন, এটা বুঝতে রাকার দেরী লাগলো না। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক এবং ধর্ম্ম-নৈতিক যোগাযোগের কথা সে বাবার কাছে শুনেছে। শিশুনাগ বংশীয় রাজা যখন ভারতের সিংহাসনে, সেই সময় (খৃঃ পূঃ ৫০২)—তখন হাকামণি বংশের প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট্ দরাস বাহু (খৃঃ পূঃ ৫২১—৪৮৫) পারশ্যে অধিষ্ঠিত। তাঁর অধীনে ভারতের অনেক অংশ, সিন্ধুদেশ এবং কাবুল পর্য্যন্ত এসে যায়, সেই সময় ভারতের সঙ্গে ইরাণের সাংস্কৃতিক যোগ কতখানি ঘটেছিল, বাবা তারই সন্ধান করছেন। কিন্তু কেন ?

ভাবতেই রাকার মনটা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বাবা নিশ্চয় দাদার কাজটা সমর্থন করেন, তাই নিজে তাকে সাহায্য করবার জন্যই এতসব পুঁথিপত্র ঘাঁটছেন।—আরো অনেকগুলো পুঁথি দেখতে পেল রাকা তার বাবার চারপাশে। প্রণব চাটুজ্যে এর মধ্যে রাকার উপস্থিতি লক্ষ্য করে বললেন, —রোহিত আসে নি রে মা ?

—না বাবা, আসে নি তো!—দাদার খবরটা আপনি দেখেছেন বাবা ?

—হ্যাঁ মা, দেখেছি! মুক্তি পেয়েই সে একটা ভাল কাজে নেমেছে। এ খুব সুখের কথা, কিন্তু একেবারে পৌরহিত্য না করলেই পারতো!

—সবাই ওকে ধরে করাচ্ছেন বাবা! উনি বৈদেশিক সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন....তাই হয় তো ওঁকেই যোগ্য ভেবেছেন সকলে!

—তা হ'তে পারে, কিন্তু সত্যি ওর ততখানি যোগ্যতা আছে কি না, আমি জানি না মা—কাজটা অত্যন্ত কঠিন।

রাকা চুপ করে রইল। প্রণব চাটুজ্যে একটু থেমে বললেন, —এ কাজের বিরাট সম্ভাবনা আছে মা রাকা, এই সাংস্কৃতিক ঐক্যই বর্ত্তমান যুগে অত্যন্ত প্রয়োজন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যকার সম্পর্ক সেই দিনই স্থাপিত হবে যেদিন সে বুঝবে তার সাংস্কৃতিক জীবনের মূল সুরটি; তার ঐক্যের রাখি-বন্ধন হবে ঐখানেই। কিন্তু সেই মিলন-রাখি বাঁধা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

—তা হোক বাবা—আপনার আশীর্ব্বাদে দাদা সে কাজ করতে পারবে।

—তোদেরও যেতে হবে। স্বাধীনতা লাভের এই মহা মহেন্দ্র-ক্ষণে ভারত আবার তার সেই ঋষিমূর্ত্তিতে প্রকটিত হোক—সমগ্র এশিয়ায়, সারা পৃথিবীতে শান্তিবারি বর্ষণ করুক। তোরা সেই যজ্ঞক্ষেত্রকে বিশ্বে বিস্তৃত কর।

উনি থামলেন। রাকা চুপটি করে বসেছিল; রোহিত এসে উপস্থিত হোল। প্রণব চাটুজ্যে বললেন—অংশুর একটা সংবাদ কাগজে বেরিয়েছে রোহিত—দেখ!

রোহিত মুহূর্ত্তমধ্যে কাগজখানা তুলে নিয়ে সংবাদটিকে পড়ে ফেললো। আনন্দে ওর চোখ দুটো যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে। —একটা কাজের মত কাজ!—কি বলিস রাকা?

রাকা কিছু বলবার পূর্ব্বেই প্রণব চাটুজ্যে স্বয়ং বললেন,

—ভারতের মুক্তি সাধনা আজ বিজয়ের পথে, কিন্তু দুঃখ আর দুর্ভাগ্য বড় বেশী, রোহিত! ভেদ-নীতির ছুরি আর

বিরোধের বহ্নি জ্বালিয়ে শ্বেত দ্বীপের সাম্রাজ্য বিলাসীরা এই দেশটাকে নরককুণ্ড করে তুলেছে। এ অবস্থায়, সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক প্রয়োজন হচ্ছে—ইতিহাসকে অবলম্বন করা। মানুষের জীবনকে স্মরণাতীত মানব-জীবন-স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করে দেখিয়ে দেওয়া যে 'এ্যাটোম বোম্‌ই' মানব-সভ্যতার চরম অভিব্যক্তি নয়;—বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরস্ত্রীকরণ বা রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত জাতি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা নিরর্থক। বিশ্বের মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে শেখানোই শান্তির একমাত্র উপায়। সংস্কৃতির সাধন-ভূমি মানুষকে সেই ঐক্যভূমিতে নিয়ে যেতে পারে। তাই এই সম্মেলনের প্রয়োজন আছে, এবং আরো বৃহত্তর প্রয়োজন আছে মানুষের মধ্যে মানবত্ববোধকে জাগ্রত করার জন্য কর্ম্মী-সংঘ গঠন।

—সে কাজ কেমন করে হবে? রোহিত প্রশ্ন করলো।

—হবে! পৃথিবীর এই নৈতিক সংকট ইতিহাসের প্রয়োজনেই ঘটেছে। তৃতীয় বিশ্বযুগের দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীন পাশ্চাত্য জগৎ তার দুর্নীতির মধ্যেও আজ মানুষের মুক্ত রূপ দেখতে পাচ্ছে বিদ্রোহী মানবাত্মার মধ্যে। এই বিদ্রোহই তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, মানুষ চিরমুক্ত, চির-স্বাধীন।—কিন্তু তোমাদের অনেক কাজ করবার আছে। অংশুকে সক্রিয় সাহায্য করতে হবে। নইলে সে একা পেরে উঠবে না!

—আমরা প্রস্তুতই আছি!—রোহিত বললো!—কিন্তু কি আমরা করতে পারবো? আমাদের বিদ্যা তো ওবিষয়ে খুব বেশি নয়।

—চেষ্টা দ্বারা বিদ্যা বাড়িয়ে নাও! ভারতের মহাবাণীর সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের, বৃহত্তর এশিয়ার সংস্কার সংস্কৃতির অভয়বাণী আহরণ কর—সেই বাণী দিকে দিকে প্রচার কর—তোমাদের দৃপ্ত যৌবনের মধ্যে প্রাচীন ভারত আবার যুব-শক্তিতে জেগে উঠুক!

কিছুক্ষণ থেমে রইলেন। তারপর ধীরে বললেন,

—সাংস্কৃতিক জয়পতাকাকে ভারতের উপর কোনো জাতিই উড়াতে পারে নি। ইংরাজ তার পশ্চিমি সভ্যতার জৌলুসে কিছুদিনের জন্য মোহ জাগিয়েছিল মাত্র, কিন্তু যুগে যুগে ভারতে অবতারের শুভ আবির্ভাব ঘটে; তাঁরাই সে মোহ ভেঙ্গে দিয়েছেন। এবার তোমাদের পালা। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন-বিভোর এই শুভ সংকল্পকে তোমরাই জয়যুক্ত করবে।

উনি বৃদ্ধ তমাল গাছটার নবীন পত্ররাজির পানে চেয়ে রইলেন। রোহিত এবং রাকা ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করলো। দীপ্ত মধ্যাহ্নের খর রশ্মি মাথায় করে শ্যামল পত্ররাজি যেন ধ্যানমগ্ন। শান্তির কী সুমহান ঐশ্বর্য্য ওর সুশীতল ছায়া-তলে! ভারত অমনি ছিল, আবার অমনি হয়ে উঠবে, অমনি উদার, গম্ভীর, বিস্তৃত, তপঃসুন্দর তপোবন!

. . .

কাঞ্চনমালার কথাটা আর একটু বলা দরকার, নইলে মানুষের সাধারণ জীবনের সার্ব্বজনীনত্বকে অস্বীকার করা হয়। মানুষ যেখানে অতি সাধারণ জৈব-জীবনের আহার-নিদ্রা-মৈথুনকে

অতিক্রম করতে পারে নি, সেই বাস্তবতার ভূমিতেই বিচরণ করে কাঞ্চনমালা। ওর চোখে উচ্চতর কোনো আদর্শ এ যাবৎ স্থাপিত হয় নি। লেখা পড়া শিখলেও সাধারণ বাস্তব জীবনের আলেখ্য এবং তারই জয়ধ্বনিতে মুখর খানকয়েক বাংলা উপন্যাসের নায়ক নায়িকাই ওর আদর্শ-জীবনের উপজীব্য। এ ছাড়া রামায়ণ মহাভারত সে পড়েছে ; তার মধ্যে থেকে বাছা-বাছা কয়েকটি চরিত্রই ওর মনের মনগড়া কল্পনায় জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। যেমন, রামায়ণ পড়তে পড়তে ও ভাবে—অহল্যাকে সতী কেন বলা হোল ? তাহ'লে তো অমন কাজ করেও সকলে সতী থাকতে পারে। তারা, মন্দোদরী এবং কুন্তী, দ্রৌপদী সম্বন্ধেও ঐরকম সব কথা ভাবে ; এবং ভেবে ঠিক করেছে যে সতীত্বের সুনির্দ্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই।

একদিন রাকাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসাই করে বসেছিল—তারা তার দেবর সুগ্রীবকে আবার বিয়ে করে সতী রইল কেমন করে এবং মন্দোদরীই বা বিভীষণকে বিয়ে করে কেন সতী রইল ? কুন্তী দ্রৌপদীকে তো সে একদম নিছক অসতী ভাবে। রাকা ওকে বোঝাতে চেয়েছিল যে একনিষ্ঠতাই সতীত্বের একমাত্র সংজ্ঞা এবং দেশকালপাত্র অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ বিবাহ বা নিয়োগ-প্রথা দিয়ে সতীত্বের বিচার চলে না। কিন্তু রাকার ওসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথার ধার দিয়েও গেল না কাঞ্চন মালা। সে সোজা বলল—সতীত্ব মনগড়া একটা জিনিষ ; এবং একনিষ্ঠতা বলে কোনো সূক্ষ্ম মানসিকতা আছে, তার প্রমাণাভাব।

রাকা থেমে গিয়েছিল। সেই থেকে রাকা আর ওকে ওসব কথা বোঝাতে চেষ্টা করে না। তাছাড়া রাকার সঙ্গে ওর দেখা হবার একমাত্র সুযোগ বিকালে পুকুরে নাইতে গিয়ে। তাও সবদিন হয় না, কারণ অধিকাংশ দিনই ওর স্বামীর বন্ধুদের জন্য বা গৃহের কার্য্যের জন্য ঠিক সময়ে ও যেতে পারে না। ইদানিং প্রায় আট দশ দিন রাকার সঙ্গে বিশেষ কথা কিছু হয় নি! রোহিতের কথা রাকার মুখে ও আগেই কিছু কিছু শুনেছিল, কিন্তু তখন বুঝতে পারে নি, রোহিত লোকটি কেমন হবে। নিজের মনের কল্পনায় তার যে ছবি ও এঁকে রেখেছিল, বাস্তবে তার মিল মোটে পাচ্ছে না।

রোহিত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওর মনটা কিছুক্ষণের জন্য অত্যন্ত নীরস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনো অম্বুজ তার স্বামীর কাছে নারী-প্রগতির বড় বড় কথা বলছে এবং বলছে যে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক, এবং সমাজ নৈতিক সঙ্ঘে সসম্মানে নারীর স্থান করে দেওয়া উচিৎ। কথাগুলো খুব জোরে জোরে উচ্চারণ করছিল অম্বুজ। ওর নিশ্চয় ইচ্ছা যে অন্তরালবর্ত্তিনী কাঞ্চনমালাও তার কথা শুনুক, শুনে বুঝুক যে অম্বুজ মেয়েদের কতখানি আপনার লোক।

কিন্তু অভয় ওসব পছন্দ করে না। বৌকে সে বন্ধুদের সামনে টেনে আনে। কিন্তু সেটা তার বৌ-সৌভাগ্য জাহির করবার জন্যই—এবং সেও অতি স্বল্পক্ষণের জন্য। ইন্‌স্‌পেক্টারদের সামনে বৌকে বের করে স্ব-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং সেও অত্যন্ত কম সময়ের জন্য। তাছাড়া অন্য সময় বৌএর উপর তার নজর

অতিশয় প্রখর। ঘরের বৌ পরের সঙ্গে প্রেম করবে—এটা অভয়ের ধাতে আদৌ সইতে চায় না। এমন একটা মানসিক দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও অভয় বন্ধুদের কাছে বৌকে টেনে বের করে, কারণ নিজের সব রকম সৌভাগ্য-গর্ব্বটাকে সে অত্যন্ত অহঙ্কারের চোখে দেখে এবং সকলকে দেখাতে চায় যে অন্য সকলের অপেক্ষা অনেক বেশি সে ভাগ্যবান।

কিন্তু এই দুর্ব্বলতার জন্য বৌকে লাইব্রেরী ঘরে ডেকে এনে মাতামাতি করতে দেবার পক্ষপাতী সে আদৌ নয়। তাই অম্বুজকে বললো,

—ওরা প্যাড়াগেঁয়ে হাবাগোবা মেয়ে; ওরা এসবের কি বুঝবে!

—বোঝাতে হবে। "ঐসব মূঢ় মুক মুখে দিতে হবে ভাষা—"

—আচ্ছা, তুমি একটা বৌ এনে আগে দৃষ্টান্ত দেখাও! অভয় বলল।

—আমি তো দেখাবোই—অম্বুজ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল—, আমি যাকে বিয়ে করবো সে হবে এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী, লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট, ক্লাবের পেট্রন, জাতীয়-যুদ্ধ-বাহিনীর কম্যাণ্ডার!

অভয় হাসছে, কিন্তু জানালার ওপাশে অন্ধকারে দাঁড়ানো বেচারা কাঞ্চনমালা হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। কি এমন বৌ আনবে অম্বুজ! কেমন বৌ? কোত্থেকে আনবে এমন বৌ? ওখান থেকেই স্বামীর মুখপানে চেয়ে বুঝলো অভয়ের হাসিটা দেঁতো হাসি। অভয়ের বৌ-গর্ব্ব যে খুবই আহত হয়েছে অম্বুজের কথায়,

তা ওর হাসি দেখলেই বোঝা যায় ; কিন্তু অম্বুজের যে যোগ্যতা আছে, অভয়ের তা নেই, এই সত্যটা অভয়ও জানে। তাই কথা পালটাবার জন্য বললো—বালিকা বিদ্যালয়টা আর হোল না এখানে।

—নিশ্চয় হবে। আমি কালই গ্রামের লোকদের ডেকে সভা করবো। অম্বুজ মহা উৎসাহে বলতে লাগলো,—এতবড় একখানা গ্রামে মেয়েদের স্কুল থাকবে না, একি হতে পারে? শিক্ষা না পেলে মেয়েরা এগুবে কি করে? আর মেয়েরা না এগুলে সবই যে বৃথা!

জানলার ওপাশে বৌটার চোখের তারা দুটো অন্ধকারে যেন জ্বলছে। অম্বুজের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিললো ওর। ওর সাদা শাড়ী অন্ধকারেও ঠাওর হচ্ছে। তাই অম্বুজ বুঝতে পারলো, তার কথার শব্দভেদী স্তোত্র-বাণগুলো ঠিক যায়গাতেই আঘাত করছে গিয়ে। সে আরো উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগলো—একটা মহিলা-সমিতি করতে হবে এখানে—মানে 'এডাল্ট এডুকেশনের' ব্যবস্থা। বড় বড় বিবাহিত মেয়েরা সেখানে গিয়ে ভাল ভাল বিষয় শিখবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শরীর পালন, স্বাস্থ্যচর্চ্চা, ব্যায়াম, তার সঙ্গে রান্নাবাড়ার কাজ, শেলাই, বোনা, গান, নাচ, বক্তৃতা দিতে শেখা……

—আর সন্তান পালন? ছেলেকে দুধ খাওয়ানো?—অভয় হেসেই প্রশ্ন করলো!

—ওটা মেয়েদের শেখাতে হয় না। ও কাজ মেয়েরা জন্ম থেকেই জানে!

—তা ঠিক! ছোটবেলা থেকে পুতুলকে দুধ খাওয়ায়—অভয় হেসেই বললো!

কিন্তু অম্বুজ অন্ধকারের পানে চেয়ে দেখলো, সাদা শাড়ীটা হঠাৎ সচল হয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে। কেন ও চলে গেল? কেন? অম্বুজের সমস্ত উৎসাহ হঠাৎ নিবে গেল যেন। অভয় খাতাপত্র গোটাতে গোটাতে বলল—আচ্ছা, তাহলে আর একবার মেয়েস্কুলের চেষ্টা করা যাক।

—হ্যাঁ, কালই করতে হবে!—বলে অম্বুজও উঠলো। আসবার সময় সে আর একবার উঠোন, ঘর ইত্যাদি যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখলো, বৌটাকে কোথাও দেখা গেল না। স্বামীর মুখে সন্তান-পালনের কথাটা শুনে ও চটে গেল না কি? কিম্বা অম্বুজের বাচালতার জন্যই চটে গেল!

অভয় বাড়ীর মধ্যে এসে দেখলো বৌ তখনো রাতের রান্না শেষ করতে পারে নি। চটে বললো—আচ্ছা নবাবের বেটি যা হোক! খাবো কখন?

—এই তো রাত মাত্র সাড়ে আট-টা!—বৌ বলল! এতক্ষণ তো আড্ডা মারলে!

—আড্ডা মারলাম তো তোর কি হারামজাদীর বেটি—তুই কোন্ নাগরের সঙ্গে রস করছিলি?—অভয় মারলো ওর পিঠে একটা লাথি।

এসব ওর অভ্যস্ত। ও সয়েই যায়, কিন্তু আজ অকস্মাৎ বলে বসলো,

—খবরদার! ভালয় ভালয় থামো! পিণ্ডি গিলে যেখানে ইচ্ছে যাও!

—বলেই ও নিজে চলে গেল অন্য ঘরে। ...ল গড়িয়ে আসন পেতে গরম ভাত নামিয়ে দিল, ডাল, ...সেদ্ধ আর মাছ ভাজা দিয়ে।

অভয় কোনো দিন বৌ-এর কাছ থেকে প্রতিবা... শোনে নি! আজ অকস্মাৎ দুবার প্রতিবাদ করায় সে স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিল—, —এমন শান্ত নিরীহ বৌটার হঠাৎ কেন এই উত্তেজনা! অম্বুজের গরম গরম কথাগুলো কি ও শুনছে নাকি? কিম্বা রোহিতের কথা? কিন্তু রোহিত ওরকম কিছু বলে নি। রোহিত অন্য ধরণের মানুষ। তার কাজ অম্বুজের মত গলাবাজি করা নয়, সে যা করে, সত্যি মনপ্রাণ দিয়ে করে আর ভালো কাজই করে। অভয় বুঝলো—অম্বুজকে ডেকে আনা তার ভালো হয় নি। ওরকম লোক যে-কোনো মেয়ের মনে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। যা প্রগতিবাদের বুলি ও ঝেড়ে গেল! অভয় সাবধান হয়ে যাবে!

খেতে বসে অভয় কথাটি কইল না। এত সামা... উপাদান দিয়ে রাত্রে ভাত সে কোনোদিন খায় না—আজ কিন্তু খেল এবং খেয়েই কয়েকটা টাকা ফতুয়ার পকেটে ফেলে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বাইরের দরজার কাছ থেকে বলে গেল,

—রাত্রে না ফিরতেও পারি; দরজা বন্ধ করে দাও।

কিন্তু রাত্রে ও ফিরবে—বৌ তা জানে। আজ যে নিশ্চয় ফিরবে—এ বিষয়ে বৌএর সন্দেহমাত্র নেই। কারণ অভয়

যে বৌকে কতখানি সন্দেহের চোখে দেখে, তা বৌএর না-জানা নয়। তাই এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল না। অভয় নিশ্চয় আসবে, অতএব সদর বন্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। অন্য ঘরে গিয়ে নিশ্চুপ বসে রইল অনেকক্ষণ। কাল যাত্রা শুনতে গিয়ে সময়টা কেটেছিল মন্দ নয়। আজ যেন কাটতেই চায় না সময়।

মনে যেন ওর একটা অজানা দুঃখ বাসা বেঁধেছে। এ দুঃখের কথা, এই বেদনার অনুভূতি ওর একান্ত অজানা ছিল। এতকাল ওর স্বামীর সংসারে ও সুখে-দুঃখে ভালই কাটাতো; স্বামীর আদর এবং অত্যাচারকে ন্যায্য পাওনা বলেই মেনে নিয়ে জীবনটাকে নৈর্ব্যক্তিক করে তুলেছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ ওর ব্যক্তিত্ব যেন জেগে উঠলো! কারণটা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু ওর মনোজগতে তার শক্তি অসীম হয়ে উঠছে। এতদিন ওর স্বামী যাদের ধরে এনেছে বন্ধু হিসেবে, তারা সব এই গ্রামেরই ছেলে—এবং আচারে ব্যবহারে সকলেই প্রায় অভয়ের মতোই। তাদের মধ্যে কোনো স্বপ্ন সৃজনের অবকাশ ছিল না, কোনো কল্পনার আশ্রয় ছিল না, কোনো আদর্শের উজ্জ্বলতা ছিল না। কিন্তু আজ যাকে সে আনলো, সে শুধু আদর্শেই উজ্জ্বল নয়, কল্পনাতেও মহীয়ান। আশীর্ব্বাদ থেকে আরম্ভ করে আত্মদোষ ক্ষালনের ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যেও তার একটি মহৎ অন্তর ঝলমল করছে, যে-অন্তরে আশ্রয় লাভ যে কোনো নারীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। ওকে ধাক্কা দিয়ে যাবার অসৌজন্যকে সে কিছুতেই স্বীকার করলো না,—এমনি তার আদর্শবোধ। হোক না সেটা মিথ্যা—আর কেউ হলে ঐ ব্যাপারটাকেই কেন্দ্র করে হয়তো মমতার সুদৃঢ় জাল

বিস্তার করতো, হয়তো লোভীর মত হাত বাড়াতো, হয়তো পাপীর মত... কিন্তু ও তার কিছুই করলো না! ওর নৈতিক নিষ্ঠা সাধারণের চোখে ভীরুতার অপবাদ পেতে পারে, কিন্তু কাঞ্চন ওকে ভীরু ভাবতে যেন লজ্জা পাচ্ছে।

কারণ অম্বুজ নামক ঐ সাহসী লোকটা,—যে তার গায়ে সত্যি ধাক্কা দিয়েছিল,—(কাঞ্চন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে এই অম্বুজ নামধারী ব্যক্তিটিই গত কালের সেই ব্যক্তি; এগাঁয়ে তারা দুজনই নতুন; আর সকলকেই ভালরকম ভাবে সে চেনে)। তার বাচালতা এবং বাহ্যিক মঙ্গলেচ্ছার মধ্যে যে কদর্য্যতা লুকিয়ে রয়েছে, পল্লীবাসিনী হলেও কাঞ্চনের তা বুঝতে দেরী হোল না। কিন্তু কাঞ্চন ভাবলো—ঐ রকম একটা লোভী যুবকের জন্য নিজকে ব্যস্ত করবার তার কোনো প্রয়োজন নেই। ও তো আঁচলে গাঁথাই আছে—বাঁধা মুরগী, জবাই করলেই হয়। কিন্তু কাঞ্চন অত ছোট নয়। তার নারীত্ব অত সস্তা নয়—এবং কাঞ্চন দেখতে চায় যে ঐ অহঙ্কারী লোকটা কত ভালো বৌ আনতে পারে!

ওর বড় বড় কথাগুলো শুধু যে কাঞ্চনকে শোনাবার জন্যই বলা, তা বোঝে কাঞ্চন। এ রকম সস্তা পলিশী অভয়ের প্রায় সব বন্ধুই এখানে এসে করে থাকে। কিন্তু কাঞ্চনকে মুগ্ধ করা অত সোজা নয়। তাই বিরক্ত হয়ে তখন চলে গিয়েছিল কাঞ্চন। এখন একলা ঘরে একান্ত নিজস্ব হয়ে সে ভাবতে লাগলো, অম্বুজ নয়, রোহিতেরই কথা!

নিজের কথাও কিছু কম ভাবছিল না কাঞ্চন। ওর জীবনটা

ভিতরের দিক থেকে যে কত বড় ফাঁকি তা আজ যেন ওর কাছে ধরা পড়ছে। লোকের চোখে ও ভাগ্যবতী এবং ওর ভাগ্যটাকে ঈর্ষা করেই প্রতিবেশী মেয়েরা ওকে সময়ে অসময়ে 'ভাগ্যবতী' বলে থাকে, কিন্তু ও যে কত বড় অভাগী তা ওরও এমন করে জানা ছিল না। স্বচ্ছল সংসারের একাধিপত্য-করা বৌ—কিন্তু আধিপত্যটা এমন নির্ম্মম শেকলে বাঁধা যে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ধরে গেছে। আজকার প্রতিবাদের মধ্যে ওর বহুদিন-সঞ্চিত সেই ব্যথার জ্বালাই ছিল!

জীবনকে সুখী করবার জন্য ওর চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। ধরিত্রীর মত সহ্যশীলা হয়ে সে তার পত্নীর কর্ত্তব্য পালন করেছে এবং এখনো করছে; নেশাখোর স্বামীর অত্যধিক আদর এবং অতিমাত্রায় অত্যাচার সে চোখ মুখ বুজে সয়েই এসেছে এতকাল, কিন্তু সেই 'পতি পরম গুরু'র যুগ আর নেই। মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা মনের অজ্ঞাতসারে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। মাতাল স্বামীর লাথী খেয়ে নিজকে সাবিত্রী ভাবতে আজকার মেয়েরা শুধু অস্বীকার করে না, লাথি খাওয়াটাকে নিজের অপমান বলে বোধ করে—ঘৃণা করে সেই অত্যাচারী স্বামীকে। কাঞ্চনের অবচেতন মনের সেই ঘৃণা আজ সচেতন হয়ে উঠলো—নিজকে অতিমাত্রায় বিড়ম্বিত ভাবতে লাগলো সে!

রোহিতের আশীর্ব্বাদটা মনে পড়লো—দেশমাতার যোগ্য-সন্তান হও!

—'তোমার সন্তান হোক'—এমন কথা রোহিত বলে নি! 'স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক'—এমন সাধারণ সহজ আশীর্ব্বাদও ওর

মুখ থেকে বের হয় না। ও নিজে যেমন অসাধারণ, ওর আশীর্ব্বাদও তেমনি অসাধারণ। কিন্তু যাই হোক—ওকে দিয়ে কাঞ্চনের কোন্ কাজ হবে? কাঞ্চনের রূপ এবং যৌবনের আবেদনকে সে অনায়াসে এড়িয়ে যাবে, এ বিশ্বাস কাঞ্চনের আছে। কিন্তু ঐ রূপ এবং যৌবন ছাড়া কাঞ্চনের আর তো কিছু সম্বল নেই!

সত্যি কি নেই? কাঞ্চন নিজের মনের অতল গহনে ডুব দিয়ে খুঁজতে লাগলো, রোহিতের কাজে লাগতে পারে, এমন কিছু সম্পদ তার আছে কি না! এবং না থাকলে তা অর্জন করা ওর পক্ষে সম্ভব কি না! অর্জন করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু অর্জনের ক্ষেত্র কোথায়? স্বামীর চোখের দৃষ্টিজালে সে বন্দিনী; এই বন্ধনকে অস্বীকার করবার মত সাহসই বা তার কৈ? কাঞ্চন ভাবতেই লাগলো।—বরং অর্জ্জন করা যেতে পারে অম্বুজের মনের কোণে প্রভাব জাগাবার শক্তি—যে কোনো মেয়েই পারে সে শক্তি অর্জন করতে—কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে—অভয় এখনো ফিরলো না, তাহলে হয়তো ফিরবে না। কাঞ্চন খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বুঝে ওর মনের চোখে যে মুখ ভাসতে লাগলো, তাকে ও চিনে, সে কিন্তু রোহিত নয়, অম্বুজ!

অনেকটা বেলায় উঠে রুক্মিণী স্নান করতে গেল। ফিরে এসে দেখলো, ওকে দেখবার জন্য এসেছে অম্বুজের মা—আর বোন

মিনি। বিরক্তি বোধ হচ্ছে রুক্মিণীর, কিন্তু দিদি ওদের সাদরে বসিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ওদের গ্রাহ্যমাত্র না করে রুক্মিণী নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, অম্বুজের মা বললেন—এসো তো মা, দেখি!

—প্রণাম কর!—সত্যভামা আদেশ করলো!

আদেশ পালন করলো রুক্মিণী। অম্বুজের মা—'বেঁচে থাকো মা—স্বামীপুত্তুর নিয়ে সংসারে সাবিত্রীর সমান হও'—বলে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করে ওর চিবুক ধরে চুমা খেলেন। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন রুক্মিণীকে। সত্তস্নাতা, তম্বঙ্গী তরুণী—চোখদুটি ছলছল করছে প্রভাতের স্নিগ্ধতায়—লাবণ্য যেন উছলে পড়ছে সারা দেহে; পছন্দ হতে একলহমাও দেরী হোল না ওঁর। সানন্দে বললেন,—বৌ করবার মতন মেয়ে। তোমাকে আমার ঘরে যেতে হবে মা—যাবে তো?

কথাটার মধ্যে ভবিষ্যতের কোন্ ইঙ্গিত রয়েছে, রুক্মিণী তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা না করেই বললো—এখন তো যেতে পারবো না মা, বিকেলে না হয়......

ওরা সবাই হেসে উঠলো। অম্বুজের মা বললেন,—আচ্ছা, মা, বিকেলেই যেও, কিন্তু আমি তোমাকে একবারেই নিয়ে যাবার কথা বলছি,—জ্ঞাতিগোত্র ছাড়িয়ে আমার বংশের লক্ষ্মী করে তোমায় নিয়ে যাব!

রুক্মিণী এবার বুঝলো; কিন্তু তখন 'আর কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলো না সে। কারণ সত্যভামা বোনের মুখ পানে চেয়ে আছে—বি. এ, পড়া বোন, বিয়ের কথায়

কি যে বলে উঠবে, এইটাই সত্যভামার ভুর্ভাবনা। সে-রকম কিছু ও না বলায় সাহস পেয়ে সত্যভামা বলল,

—অম্বুজ ঠাকুরপোর মতন বর পাওয়া তো ওরও ভাগ্যের কথা জেঠিমা! অমন ছেলে দেশে কটা আছে! রুক্মিণীকে যদি আপনার সত্যি পছন্দ হয়ে থাকে, তা হলে বলুন, বাবাকে এখানে আসতে চিঠি লিখি!

—কিন্তু আমার পছন্দটাও এক্ষেত্রে দরকার দিদি, আর সেই অম্বুজবাবুরও পছন্দের দরকার আমায়—তারপর বাবা-দাদা-তুমি……

রুক্মিণী থেমে গেল; ওরা সবাই হাসছে। অম্বুজের বোন মিনি বললো—দাদার পছন্দ করাই আছে। কালই আমায় বলছিল যে বড়বৌদির বোন আমায় হুকুম করলো রাকাকে ডাকতে।

সেই তাহলে অম্বুজ! রুক্মিণী কি যেন ভাবতে লাগলো। কিন্তু নিজের পছন্দ সম্বন্ধে যতটুকু কথা সে এর পূর্ব্বে বলে ফেলেছে—এই পল্লীনারীদের বিস্ময় জাগাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু অম্বুজের মা ওর সেই কথাটাকে সমর্থন করেই বললেন,

—তাতো বটেই মা, তোমাদের পছন্দ তো নিশ্চয়ই দরকার। তবে আমার ছেলে আমাদের পছন্দের উপরই বিশ্বেস্ করে।

—তিনি হয়তো করেন, কিন্তু আমি তা করতে পারবো না—রুক্মিণী আস্তে বললো একটু থেমে—বর্ত্তমান যুগের মেয়ে আমরা, চারটা বা ছটা পাশ-ওয়ালা বর পেলেই বর্ত্তে যাই নে, গাড়ী-ঘোড়া-গয়না পেলেও খুসী হইনে। আমরা চাই এমন একজন,

যার হাতে নিজকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সে রকম গুণ যদি আপনার ছেলের থাকে জেঠাইমা, তাহলে আমার অপছন্দের কারণ থাকবে না। হয়তো আমাকে আপনারা নির্লজ্জ ভাবছেন, কিন্তু আমি তো আপনাদের আদর্শে জীবনকে গড়ে তুলিনি। তাই আমার মনের কথা অকপটেই বললাম।

—বেশ মা, বেশ, আমি খুব খুশী হলাম তোমার কথায়। যদি প্রজাপতির ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমার ঘরেই তুমি যাবে। আমার ছেলে এসেছে, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও তুমি করতে পার। বল তো আমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দিই!......উনি কথাগুলো বললেন, কিন্তু ছেলের মা হয়ে এরকম কথা ওঁকে বলতে হবে নিতান্ত একটা বালিকার কাছে, যাকে তিনি বৌ করতে চান, এমন কল্পনা উনি কখনো করেন নি! কিন্তু আজ যেন বাধ্য হয়েই বললেন, অথচ ভেতরে ভেতরে উনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন এই অহঙ্কারী উদ্ধত প্রকৃতির মেয়েটার উপর। কিন্তু সে ভাব গোপন করে আবার বললেন—আমার বাড়ীতে একবার যেও মা আজ!

—আচ্ছা, চেষ্টা করবো ওবেলা যেতে।—বলেই রুক্মিণী প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে গেল। সত্যভামা বোনের নির্লজ্জতায় নিজেই লজ্জা পাচ্ছিল আর ক্রমাগত ক্রুদ্ধ হচ্ছিল বোনের উপর; কিন্তু অম্বুজের মা বললেন—আজকাল আর সেদিন নাই বড়বৌমা! এখনকার মত হয়ে আমাদেরকেও চলতে হবে। দেখ্‌চো তো মা—তোমার বোনকে বৌ করবো, ইচ্ছে করলেই করা যায় না।

—ওর কথা কিছু শুনবেন না জেঠাইমা, কলেজে পড়া মেয়েগুলো ঐ রকম কথা বলে। ওর কথার দাম কি? আমি বাবাকে চিঠি লিখছি, তিনি এসে কথাটা পাকাপাকি করে ঠাকুরপোকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। আসছে মাসেই বিয়েটা হয়ে যাবে।

—তা লেখ তোমার বাবাকে আসতে! তোমার বোনকে আমার পছন্দ খুবই হয়েছে মা, তবে অতবেশী লেখাপড়া, আর যে-রকম কথা বলে, আমাদের পাড়াগাঁয়ের গেরস্থ ঘর—কেমন ভয় ভয় করে মা। তুমিও তো ওরই বোন, কিন্তু তুমি কেমন শান্ত, নিরীহ মেয়ে!

—ও-ও খুব শান্ত আর নিরীহ জেঠাইমা, আপনি ঘাবড়াবেন না। অম্বুজ ঠাকুরপোর হাতে পড়লে ওর বিত্তেবাগিশগিরি দুদিনে ঢিট হয়ে যাবে। ঠাকুরপোকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো জেঠাইমা, আমি ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব'খন।

—বেশ মা,। আর তুমি যদি পার তো ওকে বিকালে আমাদের ওখানে নিয়ে যেও!

অতঃপর আরো অনেকরকম কথাবার্ত্তা হোল ওদের মধ্যে; রুক্মিণীর বিয়ের কথা তার মধ্যে খুব বেশি নাই—তাই সে সব কথা এখানে অপ্রয়োজনীয়। তবে যাবার সময় অম্বুজের মা আবার বলে গেলেন—তোমরা তাহলে বিকেলে যেও মা।

—হ্যাঁ জেঠাইমা, নিশ্চয়ই যাব!

ওঁরা বাড়ী চলে গেলেন। সত্যভামা এবার বোনকে তিরস্কার করবে, কথায় শান্ দিচ্ছে সে। কিন্তু কোথায় রুক্মিণী? সারা-

বাড়ী খুঁজেও সত্যভামা তাকে দেখতে পেল না। নিশ্চয় রাকাদের বাড়ী গেছে। রাগে সত্যভামার আপাদমস্তক জ্বলতে লাগলো। ছেলেটাকে কোলে টেনে নিয়ে রাকাদের বাড়ীর উদ্দেশেই রওনা হোল। সেখানে যদি রুক্মিণীকে দেখতে পায় তো নখে ছিঁড়ে ফেলবে, এমনই তার ভাব; কিন্তু রাকাদের বাড়ীর বিরাট। ভগ্নস্তূপ পার হয়ে যখন সে ঠাকুরদালানের সামনে এসে দাঁড়ালো, দেখতে পেল প্রণব চাটুজ্যে চণ্ডীপাঠ করছেন—

ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্—।
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি॥

ওঁর আসনের কিছুদূরে রাকা আর রুক্মিণী একটা আসনেই করযোড়ে বসে, আর অপর একখানা আসনে উপবিষ্ট রোহিতাশ্ব। সত্যভামা ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো। প্রনাম না করেই উপায় নাই। এই বাড়ীতে এমনই একটা অলৌকিক প্রভাব সব সময় আস্তৃত হয়ে আছে যে নিতান্ত অবিশ্বাসীর চিত্তকেও কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসী করে তোলে। সত্যভামা যোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইল ঐখানেই। প্রণব চাটুজ্যে পড়ছেন মাতা মহেশ্বরীর সপ্তশতী স্তোত্র :—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে! নিত্যে! ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যাহনুর্চ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥

উদাত্ত আবৃত্তি। ভক্তের কণ্ঠে ভগবতীর স্তোত্রগাথা যেন সীমাহীন আকাশকেও স্তম্ভিত করে রেখেছে। সত্যভামার শাণিত

কথাগুলো সমস্ত হারিয়ে গেল। কী এক আশ্চর্য্য মহান্ অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো ওর সারা মন। কতক্ষণ যে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক নাই; ওর ছেলেটা অশোকগাছের তলায় গিয়ে শুকনো ফুল কুড়ুচ্ছে। রাকার মা দেখতে পেয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেলেন। সত্যভামা বসে পড়লো ভাঙ্গা মন্দিরের পৈঠায়। বসে আছে তো বসেই আছে, স্বামী-শাশুড়ী-সংসার সব ওর ভুল হয়ে গেছে! কিন্তু ওর শাশুড়ী ভোলেন নি। তিনি নিজেই ডাকতে এলেন বৌমাকে। প্রণব চাটুজ্যে তখন শক্রাদি-কৃত দেবীস্তুতি পাঠ করছেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন সত্যভামার শাশুড়ী। অধ্যায় শেষ হ'লে প্রণব চাটুজ্যে থামলেন। সেই অবসরে শাশুড়ী বললেন,

—ঘরে চলো বৌমা!

সত্যভামার মনে হোল যেন এইরকম অবস্থায় তাকে ডাকা শাশুড়ীর খুবই অনুচিত হয়েছে, কিন্তু সে চিরদিনই শাশুড়ীর বাধ্য বৌমা, তাই কোনো কথা না বলে উঠে চলে এলো, আসবার সময় বলে এল

—খোকা রইল, মা, আপনি নিয়ে আসবেন।

খোকা অর্থাৎ সত্যভামার ছেলে তখন রাকার মা'র কোলে বসে বেশ জমিয়ে নিয়েছে—কাজেই তার জন্য ব্যস্ততার কোনো কারণই নাই। সত্যভামার মাও বসে বসে পাঠ শুনতে লাগলেন। পাঠ শেষ হ'লে বললেন,—বহুদিন শুনতে পাই নি ভাই। আসতেই সময় পাই না। আমার বৌমার বোন তো মস্ত ভক্ত হয়ে উঠেছে। ওকে কেমন দেখছো?

—ওরা খানার সোনা বৌঠান্! এক-আধটু মাটি লেগে থাকে, কিন্তু ওরা খাঁটি!—প্রণব চাটুজ্যে উত্তর দিয়ে রুক্মিণীর পানে তাকালেন। লজ্জায় আনন্দে রুক্মিণীর মাথাটা নীচু দিকে নামছে ক্রমাগত। সত্যভামার শাশুড়ী বললেন,—

—মেয়েটি সত্যি খুব ভাল! ইচ্ছে করে ওকে এইখানেই রাখি।

কোন দিক দিয়ে কি ভেবে এই কথাটা উনি বললেন, রুক্মিণী ঠিকমত বুঝতে পারছিল না। প্রণব চাটুজ্যে উত্তর দিলেন,

—তোমার আমার ইচ্ছায় কিছু হবার নয় বৌঠান—ইচ্ছা সেই ইচ্ছাময়ীর। ঋষি তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন,

"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্……

কত শতাব্দী পূর্ব্বে ঋষির কণ্ঠে প্রার্থনা জেগেছে—সংসারে যদি বাস করতেই হয়, মা, তাহলে মনোরমা ভার্য্যা দিও, যে ভার্য্যা মনোবৃত্তির অনুসরণ করবে।

ওঁদের এইসব কথাবার্ত্তার মধ্যে রাকা থাকতে ইচ্ছে করে না। রুক্মিণীর সঙ্গে প্রণাম করে উঠে গেল অশোকগাছটার কাছে। রোহিতও উঠলো! চলে যাচ্ছে, রুক্মিণী ওকে হাত-ইসারায় ডেকে বললো চাপা গলায়,

—ভার্য্যাং মনোরমাং না বলে যদি আমি ভর্ত্তাং মনোরমাং দেহি বলি……তাহলে কি ক্ষতি হয় কিছু?

—হ্যাঁ—প্রথমতঃ ভাষা ভুল হয়। স্ত্রীলিঙ্গে-পুংলিঙ্গে একাকার হয়ে যায়।—রোহিত হেসে বললো…তা ছাড়া ঋষিবাক্য কেউ বদলাতে পারে না!

—তাহলে আমরা মেয়েরা কি প্রার্থনা করবো ?

—আপনাদের জন্যও শত শত প্রার্থনা রচনা করেছেন ঋষি ! কিন্তু বর্ত্তমানযুগে আপনাদের একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিৎ... রোহিত থামলো !

—বলুন !—রুক্মিণী সাগ্রহে এগিয়ে এল একপা ওর দিকে।

—কথাটা প্রার্থনা নয়, প্রতিজ্ঞা—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

—আপনারা দেবী চণ্ডীকার জাতি, আপনাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ,—যিনি আপনাকে সংগ্রামে জয় করতে পারবেন, যিনি পৃথিবীতে আপনার তুল্য বলশালী তিনিই আপনার স্বামী হবেন। ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বলকে স্বামী স্বীকার করা বিশ্বমাতৃকা চণ্ডিকার অপমান করা। আজ সেই পুরুষত্বকে, সেই ক্ষাত্রবীর্য্যকে জাগিয়ে তুলবার দিন এসেছে, যে বীর্য্য স্ব-মহিমায় নারী-অন্তরকে জয় করতে সক্ষম।

—সে বীর্য্য কি আবার জাগবে ?—রুক্মিণী ম্লান হেসে শুধুলো।

—জাগবে নয়, জেগেছে। আপনারা সামান্য সাহায্য করলেই সে বীর্য্য উগ্র গতিতে এগিয়ে আসবে—অপ্রতিহত বেগে চলবে বিজয়ের পথে,—যেখানে আর্ত্তের অশ্রু, অত্যাচারীতের অসহায়তা আর সবলের স্বৈরতা, সেখানেই সে শক্তি দুর্ব্বার হয়ে প্রতিবিধান করবে অত্যাচারের। আজ আর তোষণ-নীতি বা পোষণনীতির দিন নেই, ভাগ বাঁটোয়ারার আপোষ নাই, ভীরুতার পলায়ন নেই—আজ স্ব-বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বাধীকার

অর্জন করতে হবে। যিনি সেই কাজে জীবন দান করতে পারেন তিনিই যেন স্বামী হ'ন—আজ এদেশের সকল নারীর এই একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিৎ। বিলাস-ব্যসন বিস্তর ভোগ করে এলেন—পরানুকরনে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছেন—নিজের দেশে পরবাসী হ'য়ে ভাগ্য-বিড়ম্বিত বন্দীজীবনের পর্য্যায়ে পোঁছেছেন—এখনো ঘুম যদি না ভাঙে, আর ভাঙবে কবে!

রুক্মিণী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল অশোকগাছটার শাখা ধরে। রোহিত আস্তে চলে গেল। দৃষ্টির বার হয়ে যাবার পর রুক্মিণী ভাবতে লাগলো—এই প্রমত্ত বীর্য্য। এমনি কোটি কোটি ভারত-সন্তান আজ ভারতমাতার কোল জুড়ে জেগে উঠেছে। আজকার দিনে কি আর চারটা পাশ, ভাল চাকুরীর আশায় ওঁৎ পেতে থাকা যুবকের কোনো মূল্য আছে নারীর নব জাগ্রত মনের কাছে? দিদি বৃথাই চেষ্টা করছে তাকে অম্বুজের হাতে দেবার জন্য। কিন্তু অম্বুজই-বা কেমন, সেটাও তো দেখা দরকার। রুক্মিণী বাড়ীর পথ ধরলো।

বাড়ী পোঁছবার পূর্ব্বেই দেখতে পেল, দোলের দিন যে আসরে যাত্রা হয়েছিল সেখানে বহুলোক সমবেত হয়েছেন; একজন যুবক বক্তৃতা দিচ্ছে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে। এখানে একটা গার্লস স্কুল অবিলম্বে স্থাপন করা দরকার—এই ওদের বক্তব্য। রুক্মিণী মিনিট পাঁচ শুনলো—সেই থোড়-বড়ি-খাড়ার বক্তৃতা, সেই সতী-সাবিত্রী ইত্যাদির আদর্শ, আর সেই একঘেয়ে সুর। কে লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছে? একটা বাচ্ছা ছেলেকে শুধুলো রুক্মিণী—ও কে রে?

—অম্বুজদা !—ছেলেটা জবাব দিল।

এই তাহ'লে অম্বুজ ! যাহোক-কিছু একটা করে নাম কিনতে চায়। আজ যখন সারা বাংলা আসন্ন মৃত্যুর আশংকায় পাণ্ডুর, তখন ও বালিকাবিত্যালয় খোলার প্রস্তাব করে শেলাই বোনার বিলাসিতা শেখাচ্ছে। ওর কাজ ভাল কাজ হতে পারে কিন্তু ওগুলো বীর্য্যবানের, যোদ্ধার কাজ নয়। রুক্মিণীর বিদ্রূপহাসি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

* * * *

সে রাত্রে অভয় সত্যি বাড়ী ফিরলো না। অনেকক্ষণ জেগে থেকে কাঞ্চন কখন ঘুমিয়ে ছিল, জেগে দেখে ভোর হয়ে গেছে। উঠে ছড়া-ঝাঁট থেকে আরম্ভ করে ঘরের কাজ সে যথারীতি করতে লাগল, কিন্তু আজকার কাজে ওর যেন তেমন নিষ্ঠা নেই। কেন নেই, একথা ভাবতেই ওর মন তিক্ত হয়ে উঠলো। সে এমন একজন কদর্য্য-চরিত্রের মানুষের হাতে বন্দিনী, যে তার পত্নীর সমস্ত মর্য্যাদা পদদলিত করে, কোথায় কোন ভাগাড়ে গিয়ে গলিত মাংস আহার করে। অথচ সে শকুনীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে কাঞ্চনের উপর। এই কদর্য্যতার কলঙ্কের মধ্যে ওর অবিশ্বাসের ছুরিটা যেন আরো বেশি বিষাক্ত বোধ হচ্ছে। নিজে যদি অভয় খাঁটি হোত, তাহলে হয়তো অত বেশি জ্বালা অনুভব করতো না কাঞ্চন।

গোয়াল থেকে গাইবাছুর দুটো বের করে উঠোনে বাঁধলো, তারপর রাত্রের বাসনগুলো ধুয়ে রেখে সে উনুন জ্বালালো—একটু চা তৈরী করে খাবে। কাল রাত্রে সেও কিছু খায় নি, তা, সে কথা

এতক্ষণ ওর মনেই ছিল না। কিন্তু কেন খায়নি? না খাবার মত কি এমন হয়েছিল? হয় নি কিছুই। কাঞ্চন কত কি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। যাক গে! ওর সবল সুস্থ শরীর—একরাত্রি না খেলে কিছুই ক্ষতি হবে না। চা তৈরী করছে কাঞ্চন—ঘরের গাইদুটোর দুধ ও নিজেই দুইয়ে নিতে পারে। চায়ের জল চড়িয়ে উঠোনে বাঁধা গরুদুটোর দুধ দুইতে বসলো। এখনো বেশি বেলা হয় নি, রাখালটা আসতে রোজ দেরী করে! একা ঘরে কাঞ্চন অসম্বৃত বেশেই গরুর দুধ দোয়াচ্ছে—অকস্মাৎ,

—অভয়! এখনো ঘুমুচ্ছো নাকি হে?

আপনাকে সম্বৃত করতে গিয়ে কাঞ্চনের দোয়া দুধটা চলকে পড়ে গেল, কিন্তু তার পূর্ব্বেই অম্বুজ উঠোনে ঢুকে পড়েছে। গত রাত্রে কাঞ্চন সদর দরজাটা বন্ধ করে নি নাকি?

—আহা-হা! সবটাই পড়ে গেল নাকি বৌদি?—অম্বুজ হেসে হেসে বললো।

—না!—কাঞ্চন নিজেকে সাম্‌লাবার জন্য শাড়ীখানা ভাল করে জড়িয়ে নিতে যাচ্ছে, কিন্তু বেশী তাড়াতাড়ি কোনো কাজ করতে গেলে কাজে গোলযোগও বেশি হয়—তাই বিব্রত কাঞ্চনের চেষ্টা ব্যর্থ হতে লাগলো। কে জানে, এর মধ্যে কাঞ্চনের অপরাধ কতখানি? উঠে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা ঘোমটা টেনে দিল কাঞ্চন। অম্বুজ কিন্তু প্রশ্ন করলো,

—অভয় কোথায়—ঘুমুচ্ছে?

—না, বাইরে গেছে, আসবে এখুনি!

—আমি তাহলে ঐ লাইব্রেরী-ঘরে বসছি গিয়ে।

অম্বুজ উঠোনের দিকের দরজার শিকল খুলে লাইব্রেরী ঘরের চৌকীটায় বসলো এসে। কাঞ্চন চলে গেল তার চায়ের যোগাড়ে। কিন্তু কাঞ্চন লজ্জা পেয়েছে হয়তো! এবং এখনো হয়ত ভয় পাচ্ছে অম্বুজ বসে থাকার জন্য। অভয় এসে যদি অম্বুজকে এত সকালে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে তাহলে কাঞ্চনের লাঞ্ছনার অন্ত থাকবে না—এ তত্ত্ব কাঞ্চন ভালই জানে। কিন্তু কি করা যায়! অম্বুজকে চলে যেতেও বলতে পারে না কাঞ্চন। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সে চা তৈরী করতে লাগলো।

অম্বুজ চৌকির উপর বসে নিজেকে সামলাচ্ছে। পূর্ণাঙ্গী যুবতীর অমন নিখুঁৎ দেহ-সুষমা ও এর আগে অমন করে আর কখনো দেখে নি। এখনো বুকের ভিতরটা কেমন করছে যেন অম্বুজের।

অভয়টা সত্যি ভাগ্যবান! কি সুন্দর বৌ হয়েছে ওর! গঠন যেন পাথর কুঁদে তৈরী। ওর যৌবন বোধ হয় কোনো দিন অস্ত যাবে না। সহরের সাজগোজপরা মেয়েদের বিস্তর দেখেছে অম্বুজ। কিন্তু সে শুধুই সাজগোজ। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেই তার অসারত্ব বেরিয়ে পড়ে। তার মধ্যে কোথায় এমন স্বাস্থ্য-সৌকুমার্য্য, এমন নিটোলতা, যৌবনের এমন অজেয় আহ্বান-লিপি!···ওকে আর একবার দেখা যায় না!

খুনের মধ্যে কোথায় এতখানি লোভাতুরতা লুকিয়ে ছিল,

অম্বুজের জানা ছিল না। একটু সামলেই ওর মনটা নিবিড় আনন্দে নিলর্জ্জ হয়ে উঠলো। ডাক দিয়ে বলল,—চা করছো নাকি বৌদি! দিও তাহলে একবাটি!

শুনতে পেল কাঞ্চন, কিন্তু উত্তর দেবে কি না, ঠিক করতে পারছে না সে। উত্তর না দিক, চা একবাটি তৈরী করে সে দেবে গিয়ে। কিন্তু শুধু চা কেমন করে দেওয়া যায়? চিঁড়ে-মুড়ি দিয়ে ওরকম একটা ভদ্র লোককে চা দেওয়া সভ্যতা-সম্মত হবে কি না, জানে না কাঞ্চন, অথচ ওর খুবই ইচ্ছে। আবার ভয়ও যথেষ্ট, কারণ অভয় এসব নিশ্চয় পছন্দ করবে না। কিন্তু কাঞ্চন অকস্মাৎ ভয়কে জয় করলো। অভয়ের গত রাত্রের ব্যবহার এবং রাত্রে বাড়ী না ফেরার জন্য রুদ্ধ অভিমান আর আত্মগ্লানি ঐ নিতান্ত গোবেচারা কূলবধূকে যেন অভিসারিকার অনায়াসগতি দান করলো। চায়ের বাটি হাতে সে এসে দাঁড়ালো লাইব্রেরী-ঘরে।

—ও! এনেছো! দাও! ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ!—অম্বুজ সত্বরে কায়দায় উচ্চারণ করলো।

—দেখুন, চিনি ঠিক হয়েছে কি না!—কাঞ্চন মৃদু হেসে অনুরোধ করলো।

—চিনি! ও তোমার হাতেই যথেষ্ট আছে!—হাসলো অম্বুজ বলতে বলতে!

—ভাগ্যিস হাতেই আছে! না হলে কনট্রোলে চিনি মোটে পাওয়া যায় না। দুটি মুড়ি-চিড়ে কিছু দেব?—কাঞ্চন যেন বিশেষ পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে!

—দাও!—যা আছে, নিয়ে এসো!—অম্বুজ কথাটা সাধারণ ভাবেই বলেছে নিশ্চয়!

—যা আছে, সবই নিতে পারবেন তো?—আছে কিন্তু অনেক কিছু—বলেই কাঞ্চন ত্বরিতে চলে গেল চিড়ে-মুড়ি আনতে! ওর মুখে তীরের মত তীক্ষ্ণ হাসির ঝিলিক অম্বুজের বুকে মৃত্যুবান হানলো; অম্বুজ মরিয়া হয়ে উঠলো মুহূর্তে!

বৌটা তখনো আমগাছতলা পার হয় নি; অম্বুজ উঠোনের মাঝেই গিয়ে ধরলো ওর হাতখানা; ওর তনুলতা থরথর কাঁপছে!

*　　*　　*

জীবনের এই সাংঘাতিক ক্ষণটা শুভক্ষণ কি অশুভক্ষণ জানে না কাঞ্চন, কিন্তু অশুভ বলে ওর মনে হোল না। মনে হোল, ও যেন আজ একজন পুরুষের সত্যিকার ভালবাসা পেয়েছে। ওর দেহ এবং মন কলুষিত নয়, ধন্য হয়ে গেছে! গৃহলক্ষ্মী কাঞ্চনের মন কখন, কোন ফাঁকে এতখানি নীচে নেমে গেছে, কে জানে, কিন্তু এই নীচতাকে সে শুধু স্বীকারই করলো না, সুরাপানের মত একটা তীব্র আনন্দে আবিষ্ট হয়ে [illegible]লো—স্বামীকে অস্বীকার করবার একটা আশ্রয় পেয়ে যেন অপরাজেয়া হয়ে উঠলো!

নিজের জীবনটাকে অতীত দুবছরের কালো পটভূমিকায় দেখছিল সে। বেশ দেখাচ্ছে। শ্মশানের কৃষ্ণ অঙ্গারস্তূপে দাঁড়িয়ে যেন উলঙ্গিনী কালী মূর্ত্তি। কিন্তু ওর লজ্জা বোধ [illegible] এমন একটা উপমা মনে আসার জন্য। কালী জগৎ

বরেণ্যা, জগতের উপাসিতা, আর কাঞ্চন আজ এই মুহূর্ত্তে এমন এক স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে বিশ্বের ঘৃণা ওর সর্ব্ব-দেহমনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে। হোক! কাঞ্চন গ্রাহ্য করে না। সে একটা আনন্দের অসহনীয় আবেশের মধ্যে ঘরের কাজ করে যেতে লাগলো।

অভয় ফিরে এলো তারও খানিক পরে; তখনো তার চোখ মুখ রাত্রি জাগরণ এবং মদ্যপানের চিহ্নে চিহ্নিত। কিন্তু কাঞ্চন ওকে দেখবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করলো না।—অম্বুজের আসার কথাটা ওকে জানাবার জন্য বলল,

—বাবুদের নাটশালায় বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মিটিং হচ্ছে। অম্বুজ ঠাকুরপো তোমায় দু'বার ডাকতে এসেছিলেন,··· যাবে তো এখুনি যাও।

—যাচ্ছি! আগে এককাপ চা খাওয়াও তো!—বলে অভয় কুয়োতলায় গিয়ে মুখ হাত ধুতে বসলো। কাঞ্চন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় দফা চা তৈরী করে সে অভয়কে দিল। একখানা ফরসা ধুতিও বার করে দিল মিটিংএ যাবার জন্য, বললো;—দাঁড়ি কামিয়ে নাও।

—থাকগে! কোন্ বা বিয়ে, তার দু'পায়ে আলতা—বলে অভয় দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে কাপড় ছাড়তে লাগলো।

—বিয়ে যেমনই হোক, আলতা পরতে হলে এক পায়ে পরা চলে না।

কাঞ্চন এমন সুরে কথা বললো, যেন ওদের স্বামী স্ত্রীর

চলে গেল বাইরের দিকে,—একমুঠো চাল ছড়িয়ে দিল ওঠোনে। ছাতের কার্ণিসে-বসা পায়রাগুলো এসে খেতে লাগলো। ভারী ভাল লাগে পায়রাকে রুক্মিণীর এমনি করে চাল খাওয়াতে। শ' খানেক পায়রা এক সঙ্গে জমেছে, চমৎকার দেখাচ্ছে। শাদা, কালো পায়রা—লেজ-চওড়া লোমশ পায়রা—খয়রা রংএর লক্কা পায়রা—রুক্মিণী ওদের দুএকটাকে ধরে আকাশের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে—ওরা আবার এসে বসছে উঠোনে। ঘুরে ঘুরে চাল খাচ্ছে। ভারী সুন্দর!

মিটিং শেষ করে সত্যভামার স্বামী ঘরে ফিরেই রুক্মিণীকে উঠোনে দেখলেন পায়রা নিয়ে খেলা করতে। বিদুষী শ্যালিকার প্রশংসা পাবার জন্যই বললেন,

—এখানে বালিকাবিত্তালয় খোলা ঠিক হয়ে গেল রুক্মিণী।—

—ও ওসব পছন্দ করে না—সত্যভামা স্বামীকে বললো।

—কেন?—মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা কি ভালো কাজ নয়? আজ দেশের প্রত্যেকটি নারী-পুরুষকে শিক্ষিত হতে হবে—আপনার অধিকার বুঝে নিতে হবে।

রুক্মিণী এবারও কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু সত্যভামার স্বামী জমিদার মানুষ! নিজের প্রাপ্য প্রশংসাটা আদায় না করে উনি ছাড়বেন না।

—তোর মত কি স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে নাকি রে রুক্মিণী? উনি শুধুলেন।

—না—রুক্মিণী উঠে দাঁড়ালো, যেন রুখে দাঁড়ালো,—বলতে লাগলো,—স্ত্রী-শিক্ষা খুবই ভালো কাজ, এবং অত্যন্ত দরকারী

কাজ, সেটা না হলেই আমাদের চলবে না, এ সত্য সহস্রবার শত সহস্র মনীষীর কণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আজ এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে দেশ যখন স্বাধীনতার তোরণদ্বারে, আর যখন বিদেশী শক্তি আমাদের চিরদাসত্ব কায়েমী রাখবার জন্য বিভিন্ন রোয়েদাদ দিয়ে দিয়ে সমস্ত সংঘবদ্ধতাকে বিষাক্ত ছুরি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে, তখন বালিকাবিদ্যালয় নিয়ে মাতামাতি করবার সময় নিতান্তই অল্প। সর্ব্বাগ্রে দেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য আজ আগুয়ান হতে হবে—সর্ব্বাগ্রে আজ দেশের মুক্তি-যজ্ঞের সমিধ আহরণ করতে যেতে হবে। তারপর শিক্ষা-দীক্ষা, কলা-কাষ্ঠা-কৃষ্টি সংরক্ষণের কাজ। তাছাড়া—রুক্মিণী একমিনিট থামলো—পিছনে আরেকজন কে যেন দাঁড়িয়ে,

—তাছাড়া, বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের কাজ বৃদ্ধদের কাজ, যাঁরা জীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষার স্বরূপ বুঝেছেন, অশিক্ষা আর সুশিক্ষার মধ্যে তফাৎটা যাচাই করে নিতে জানেন, তাঁরাই এ কাজে এগিয়ে যাবেন এবং তাঁদের সহায়ক হবে রাষ্ট্র। একাজ সর্ব্বতোভাবে রাষ্ট্রেরই কাজ; মুক্ত, স্বাধীন দেশে তাই হয়ে থাকে। দেশের মানুষকে শিক্ষিত করবার ভার থাকে রাষ্ট্রের উপর এবং সেই শিক্ষাই হয় রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সন্তানের যোগ্য শিক্ষা। আমাদিকে সর্ব্বাগ্রে সেই মুক্ত, স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—তারপর বালক-বালিকাবিদ্যালয়। আজ যখন দেশের জাতিগত ঐক্য বিধ্বস্ত হচ্ছে, কৃষ্টি ধ্বংস হতে বসেছে, জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠছে, তখন বালিকাবিদ্যালয়ের বিলাসিতা করে খবরের কাগজে সস্তা নাম ছাপাবার কাজে যে

যুবশক্তি নিজেদিকে বিড়ম্বিত করে, তাকে আমি শুধু অগ্রাহ্যই করি না, ঘৃণা করি! আজ প্রত্যেকটি যুবকের উচিত, দেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করা। বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ শান্তির সময়ের কাজ। আজ বিদ্রোহ জেগেছে জাতির জীবনে। আত্মরক্ষা এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠায় তার উদগ্র হওয়া উচিৎ। তা না করে ভীরুর মতন যারা গৃহকোণে বালিকা নিয়ে ঐক্য, বাক্য, পড়ায়, তাদের ঐক্য তো নাইই—, বাক্যও মিথ্যা বাক্য।—রুক্মিণী যেন প্রকাণ্ড একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে থামলো। জামাইবাবুর পিছনে অম্বুজ—ওর মুখ খানা কালো হয়ে উঠেছে। রুক্মিণী নিজের ঘরে ঢুকলো গিয়ে।

সম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভের জন্য যে কাজ মানুষ করতে যায়, তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে দেখলে তার নিশ্চয়ই ক্ষুন্ন হবার কথা; অম্বুজেরও তাই হোল। গ্রামে একটা বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করার কাজে অগ্রণী হয়ে সে রুক্মিণীর অন্তর জয় করবে, ভেবেছিল, এবং রীতিমত চিন্তা করেই তার প্ল্যান খাড়া করেছিল। কিন্তু রুক্মিণী যা বললো, তাতে অম্বুজের আশাভরসা একদম গেল অতলে তলিয়ে। অথচ রুক্মিণীর কথাগুলো খুব অযৌক্তিকও বলা যায় না। শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রচেষ্টা দু'বছর পরে হলেও ক্ষতি হবে না। গান বা ছবি আঁকা এখন দশবছরের জন্য মুলতুবি রাখলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না।—এখন চাই আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি,

—বিশেষ ক'রে বাংলার এই দুর্দ্দিন,—শতবৎসরের ইতিহাসে যার তুলনা মেলে না—তার থেকে উদ্ধার লাভ না করা পর্য্যন্ত অন্য কোনোরকম আন্দোলন নিয়ে মেতে থাকা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ; জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। আজ যখন জাতিবৈরী বাংলাকে বিধ্বস্ত করতে যাচ্ছে, তখন পল্লীর কোলে বসে বালিকা-শিক্ষার অজুহাতে প্রমত্ত যৌবন-শক্তিকে ব্যর্থ হতে দেওয়ার মত পাপ আর নাই। কিন্তু অম্বুজ এ সত্য তেমন তীব্র ভাবে অনুভব করে না। সে শুধু বিলাসী নয়, ব্যসনাসক্ত!

অথচ রুক্মিণীর অপূর্ব্ব দেহসুষমা ওকে মুগ্ধ করেছে। ও চায়, ঐ মেয়েটি তার পাশে এসে দাঁড়াক,—তার সঙ্গে মোটরে চড়ে হাওয়া খেতে চলুক,—তার হাতে হাত রেখে সিনেমা দেখুক এবং এই রকম অনেক কিছুই চায় অম্বুজ ওকে নিয়ে করতে; কিন্তু ঐ ইস্পাতের মত ধারালো মেয়েটা যে অত সহজে রাজি হবে তার বিলাসের জীবনে নামতে, তা মনে হচ্ছে না। তবে সত্যভামা, ঐ মেয়েটির দিদি তার স্বপক্ষে আছে। তাই অম্বুজ ঘরের বারান্দার কোনে বসলো। সত্যভামা তাড়াতাড়ি একখানি আসন দিয়ে বললো—বসুন ঠাকুরপো। বক্তৃতা করা ওর স্বভাব ঠাকুরপো, দেখছেন তো?

—হ্যাঁ—অম্বুজ নিরস হাসি হাসলো—অবশ্য ওঁর কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ বৌদি, কিন্তু ওভাবে আমাদের প্রেরণা ওঁরা যোগাবেন, তবে তো আমরা এগুবো!

বলিহারি বুদ্ধি অম্বুজের! কথাটা এমন প্যাঁচে সে বললো যে ঘরের ভিতর চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রুক্মিণী শুনতে পেল

সেটা। বাঁ হাতে চুলের গোড়াটা ধরে ডান হাতে চিরুণীখানা নিয়েই সে বাইরে এসে দাঁড়ালো, যেন মূর্ত্তিমতী প্রেরণা। হেসেই বললো,—

—প্রেরণা যোগালে এগিয়ে যেতে পারবেন আপনি? আছে সে শক্তি?

—শক্তি তো আপনারাই। আপনারাই শক্তি যোগাবেন।

হ্যাঁ কথা বলতে পারে অম্বুজ! রুক্মিণী মুগ্ধ হচ্ছে। বললো,

—আমার দেওয়া শক্তি ধারণ করবার মত শক্তিও তো থাকা দরকার। তাল গাছে বাজ পড়লে গাছটাই পুড়ে যায়··· জানেন তো!

—হ্যাঁ, আমি তালগাছ কি না, সেটা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

রুক্মিণী আর কিছু বললো না। চুলগুলো ধরে ঘরে ঢুকে এলোখোঁপা বাঁধলো; তারপর বেশ ভদ্রভাবেই এলো বাইরে। ইতিমধ্যে সত্যভামা স্বামীর জন্য আর অম্বুজের জন্য কিঞ্চিৎ জলযোগ ঠিক করেছে। বেলা অনেকটা হয়েছে, প্রায় মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়। তাই অম্বুজ বললো—থাক বৌদি, ওসব কেন আবার?

কিন্তু সত্যভামা ছাড়লো না, খাবারের পাত্র এগিয়ে দিল অম্বুজের দিকে—বললো,—এখানে খেতে দেবার মত কিছু নেই ঠাকুরপো,—কোনো কিছুই পাওয়া যায় না দেশে আজকাল। আপনি তো থাকেন না, জানবেন কি করে!

—জানি বৌদি; দেশে আজকাল সবজিনিষেরই অভাব; সবই কনট্রোল-করা।

—জানেন তো ?—রুক্মিণী বললো—চাল, ডাল আটা-চিনি, সরষের তেল নেই, পরবার কাপড় নেই, গা' মুছবার গামছা নেই, আছে শুধু ভেদবুদ্ধির বিদ্বেষ, স্বার্থান্ধতা। স্ব-প্রভুত্ব কায়েমী রাখবার ষড়যন্ত্র আর সুযোগ সন্ধানের লুঠতরাজ। এসব তো আছেই, তার উপর আসছে বিদেশী বণিকের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার স্বর্ণমৃগ। আর তাই লাভ করবার জন্য আমরা ঘরে ঘরে রক্তা-রক্তি আরম্ভ করেছি। শুধু কি তাই,—চিরপূজ্যা দেশজননী আজ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হতে চলেছেন। আর আমরা তাকে খণ্ডিত করবার জন্য আপনাপন অস্ত্রে শাণ দিচ্ছি। আজ ভারতের এই নিবিড় অন্ধকারময় দুর্দ্দিনে আপনাদের যৌবন-শক্তির এতটুকু অপচয় করাও তো উচিৎ নয় !

রুক্মিণী কিছুক্ষণ থামলো—অম্বুজ কোনো কথা বললো না। বেশ লাগছে রুক্মিণীর কণ্ঠের কলঝঙ্কার শুনতে। চমৎকার গলার স্বর ওর, আর বেশ গুছিয়ে বলতেও পারে। অম্বুজ চেয়ে আছে মুখপানে। রুক্মিণী বললো,—স্ত্রীশিক্ষা বা বালিকাবিদ্যালয় খোলা খুব ভালো কাজ কিন্তু ওসব কাজ সর্ব্বাগ্রে রাষ্ট্রের কাজ। সেই রাষ্ট্রই যাদের নেই, তাদের সর্ব্বপ্রথম কাজ স্বরাষ্ট্র রচনা করা, স্বরাট্ হওয়া। এখন এই অতি সঙ্কট মুহূর্ত্তে, যখন ইংরাজ ভারত ছাড়বার কথা আন্তরিক না হোক মুখেও বলছে আর ভেতরে ভেতরে ভেদনীতির ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে আরও শতাব্দি-কাল টিকে থাকবার জন্য, সেই সুকঠিন সময়েই দেশের যৌবন-শক্তি দূর পল্লীগ্রামের কয়েকটা কচি মেয়েকে ক, খ, পড়াবার কাজে অপব্যয়িত হবে, এটা আমি কিছুতেই সমর্থন করি নে।

ও-কাজের জন্য বৃদ্ধরা আছেন, ছেলেমেয়ের মায়েরা আছেন, এবং দেশের রাজস্ব-তহবিল আছে—ওসব কাজ এখন তাঁদের। আপনাদের সর্ব্বাগ্রে যেতে হবে দেশের রাজনৈতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে এই সঙ্কট মুহূর্ত্তকে জয়ের নিশ্চিন্ততা দিতে। এ ছাড়া আপনাদের অন্য কোনো কাজ আছে বলে আমি মনে করি না।

—বালিকাদের শিক্ষাও দেশের রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজন!

—সেটা অনেকখানা হয়েছে, বাকিটা দু-চার বছর পরে হলেও কিছু ক্ষতি হবে না। আজ সর্ব্বাগ্রে অধিকার ছিনিয়ে আনুন বিদেশী বণিকের হাত থেকে—নইলে ঐ শিক্ষা,—যে শিক্ষা বৈদেশিকতার কদর্য্যতায় কলঙ্কিত, তার থেকে দেশের মাতৃজাতি মুক্তি পাবে না। ইংরাজ ভারত ছাড়বার সময় ভারতকে চির-পরাধীন করে রেখে যাবার ব্যবস্থা পাকা করে আনছে; এখন কি আপনাদের ঘরের কোণে বালিকা বিদ্যালয়ের কাজে বসে থাকা উচিৎ! ওসব কাজ খুব ভাল কাজ, কিন্তু ওসব ভাল কাজ পরে হবে। আগে ডালভাতের যোগাড় না করে কেউ মাছ কিনতে বাজারে গেলে মানুষ তাকে নির্ব্বোধই ভাবে। আপনাদের ডালভাত আজ যেতে বসেছে। ইংরেজ এই দেশেরই কয়েকজন মানুষকে নিয়ে এমন জাতিবৈরী সৃষ্টি করেছে যার তুলনায় প্রাচীন যুগের বিশ্বাস-ঘাতকেরা দেবতার পর্য্যায়ে পড়ে। ইংরাজ সুকৌশলে এই জাতিবৈরীদেরকেই আমাদের চোখে দেবতারূপে দেখাচ্ছে; তাদের কথা শুনে শুনে আমরা ক্লান্ত হতে হতে চরম শিখণ্ডীতে পৌঁছে গেছি। না পুরুষ, না বা নারী। সব বুঝেও মুখে

কথা খসিয়ে প্রতিবাদ করবার মত স্পর্দ্ধাও আমাদের আজ নেই। আপনাকে সঙ্কুচিত করতে করতে শামুকের পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছি কিন্তু শামুকের মত পিঠের খোল যতই শক্ত করি—ওদের প্রচণ্ড আঘাতে সে খোল ভাঙ্গবেই। গতিহীন আমরা তখন ছুটেও পালাতে পারবো না। এই শম্বুকের গতিকে শ্যেনগতি দান করতে হবে। এই অন্ধপ্রায় দৃষ্টিকে শ্যেনদৃষ্টি দিতে হবে, এই পারলৌকিক মোক্ষপ্রয়াসী স্তাবক জাতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আগে ইহলোকের বাঁচবার অধিকার অর্জন কর, নইলে পরলোকের দ্বারও রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাপুরুষ কোনো কালে, কোনো লোকেই শ্রেয়ঃ লাভ করে না, করতে পারে না।

রুক্মিণী থামলো এতক্ষণ পরে। অম্বুজ এবং সত্যভামা দুজনেই ওর মুখ পানে চেয়েছিল। সত্যভামা এতক্ষণে বললো,

—এসব শিখলি কোথায় তুই রুক্মিণী? রাকার বাবার কাছে নিশ্চয়!

—রাকার বাবা আরো অনেক উঁচু স্তরের কথা বলেন। রাকাই এসব কথা বলতে পারে—এর থেকে অনেক বড় কথাও বলতে পারে—বলেই রুক্মিণী চলে গেল উঠে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সত্যভামার কথাটায় ও যেন অত্যন্ত আহত হয়েছে। কারণ সত্যভামা যে ওর মুখে এই রকম বক্তৃতা শুনতে রাজি নয়, এটা তার প্রশ্নেই স্পষ্ট! কিন্তু অম্বুজ বললো—উনি কথাগুলো খুব খাঁটি বলছেন বৌদি!

—না ঠাকুরপো, আমাদের পাড়াগাঁয়ের ঘর-সংসার করতে হবে, ও সব রাজনীতিটিতিতে কি আমাদের দরকার!

বাবাকে আমি আগেই বলেছিলাম, ওকে অত লেখা পড়া শেখাবেন না!

—এ সব লেখাপড়ার কথা নয় বৌদি, এসব হচ্ছে অনুভূতির কথা! বি. এ, পড়লেই এসব শেখা যায় না। আমার খুব ভাল লাগলো! আচ্ছা বৌদি, যাই এখন!

অম্বুজ চলে গেল, কিন্তু জানিয়ে গেল, রুক্মিণীকে তার খুব ভাল লেগেছে। অতএব সত্যভামা তৎক্ষণাৎ খুসী হয়ে উঠলো রুক্মিণীর উপর। আজকালকার ছেলেদের মুগ্ধ করতে ঐরকম বক্তৃতাই তো করা দরকার! রুক্মিণী ঠিকই করেছে। অম্বুজের পছন্দ হলে রুক্মিণীকে ধমক দিয়ে পছন্দ করাবে দাদা, বাবা আর সত্যভামা স্বয়ং। কিন্তু রুক্মিণী গেল কোন্ দিকে? আবার রাকাদের বাড়ী গেল নাকি?

নাঃ—রুক্মিণী প্রকাণ্ড বাড়ীটার প্রকাণ্ডতর উঠোনের ওদিকের কোণে একটা আমড়াগাছের তলায় দাঁড়িয়ে। গাছটার সমস্ত পাতা শীতে ঝরে পড়েছে, ঠিক যেন মরা শুক্‌নো গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে সে। হিন্দুধর্ম্মটাও ঠিক ওমনি, ওমনি পাতাঝরা বিশাল একটা মহীরুহ—যেন মৃত। কিন্তু মৃত সে নয়। দিন কতক পরেই নবপত্র-পল্লব-মুকুলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে; শুধু কাল বৈশাখীর কয়েকটা ঝড়ঝাপ্‌টা ওর মাথায় বয়ে যাওয়া চাই। আঘাত না পেলে ও যেন জীবন পায় না। ও যেন দধীচির মত ধ্যানমগ্নই আছে, আপনার অস্থি দিয়ে পরের শত্রুনিপাত করার পারলৌকিক পুণ্যসঞ্চয় ওর কাম্য; কিন্তু কে জানে কবে ও আবার পরশুরামের মত প্রজ্জ্বলন্ত হয়ে উঠবে, রুদ্র-কুঠার হস্তে

একবিংশতিবার নিঃশত্রু করে দেবে ভারতভূমি!—রুক্মিণী গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল।

আজ দরকার ধর্ম্ম-সংগঠনের। আজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন এই আত্মবিস্মৃত জাতিকে মনে করিয়ে দেওয়া যে সে সর্ব্বাগ্রে হিন্দু, সর্ব্বাগ্রে সে আর্য্যবংশধর, অমৃতের সন্তান, অমর। আগে সে তার হিন্দুত্ববোধকে জাগ্রত করে নিজের ধর্ম্মগত ধারাকে প্রবহমান করুক—তারপর তার মহাজাতীয়তার মহত্তোমহীয়ান বাণী পৃথিবীকে শোনাবে। ঐ মহাবাণী শোনাবার সে-ই একমাত্র অধিকারী, সে-ই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ববৃহৎ আর সর্ব্বাপেক্ষা উদার ধর্ম্মের সন্তান; কিন্তু সে নিজে ভুলে গেছে, সে কে! সর্ব্বাগ্রে তার আত্মবোধকে তার মধ্যে জাগ্রত করতে হবে।

এই আত্মবিস্মৃতির মূলে বহু শতাব্দীর ঐতিহাসিক গ্লানি রয়েছে কলঙ্ক-পঙ্কের মত স্তূপীকৃত হয়ে; কিন্তু সেই কলঙ্ক ভারতের হিন্দুত্ববোধকে এমন করে আচ্ছন্ন করে দেয়নি, মাত্র পৌনে দু'শ বছরের বৃটিশ শাসন যা করেছে। পশ্চিমী সভ্যতার ভোগ-প্রবণ রাজনীতি আর সমাজনীতির কদর্য্যতায় ভারতের অনন্ত-যৌবনা অম্লানপঙ্কজা ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী আজ প্রসাধন-প্রয়াসিনী,—এবং সেই প্রসাধন অন্তঃসারশূন্য কয়েকটা রুজ-পাউডার-ক্রীম স্নো মাত্র। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুন্দর ধূপ-দীপ-নির্ম্মাল্যের প্রসাধন আজ ভুলেছে ভারত, তাই ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে আজ বিদেশী-শিক্ষায় শিক্ষিত নিতান্ত অর্ব্বাচীন এবং অনধিকারীরা সদম্ভে গদা ঘুরিয়ে বিশ্বপ্রেমের বুলি আওড়ায়, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কায়েমি করবার জন্য ধর্ম্মের বচন আবৃত্তি করে, আর পৃথিবীর লোকের

নমস্কার কুড়োবার জন্য নিজকে অতিমানব ...জয়ে শ্রীগীতা, উপনিষদের উদ্গাতা সাজে।

কিন্তু এসব ভেবে কোনো লাভ নাই; একটা সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পন্থা চাই, এবং সেই পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া চাই। সে পন্থা কি পন্থা? কে দেখিয়ে দেবে সেই পথ? কার সঙ্গে সে পথে চলবে রুক্মিণী?—আমড়া গাছটার চারদিকে একপাক ঘুরে এল রুক্মিণী অনর্থক।

রাকার দাদা অংশু একটা কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। সে পন্থা কতখানি কার্য্যকরী হবে ভারতের ধর্ম্ম-সংগঠনে এবং এই দুর্ভাগা বাংলাদেশের বিশ্বপ্রেমের বুলিতে সংস্কৃত মানুষগুলোর মোহমুদ্গরের কাজ করতে—তা তো জানা নাই। তবু রুক্মিণীর চোখের সামনে ঐ একটা মাত্র পন্থা আজ খোলা রয়েছে। কিন্তু কে জানে অংশু কেমন? কে জানে অংশু তাকে ঐ পথে যাবার অধিকার দেবে কি না? রুক্মিণী আর একপাক ঘুরে এল গাছটাকে। সত্যভামা ডাকছে।

—যাই দিদি—বলে আরো আধপাক ঘুরতেই দেখতে পেল, একটা কাঠবিড়ালী আমড়াগাছটায় চড়ছে। একছুটে চড়লো এসে। ঐ কাঠবিড়ালীও রামচন্দ্রের সাগর বন্ধনে সাহায্য করেছিল। অত্যাচারী, ব্যভিচারী রাবণ ধ্বংশ হয়েছিল যার ফলে। রুক্মিণীও তাহলে সাহায্য করতে পারবে অংশুর সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের কাজে। অংশু পরশু আসছে। রুক্মিণী তার কাছে প্রার্থনা জানাবে তাকে যেন অংশুর বিরাট কাজের এক অংশে স্থান দেওয়া হয়।

সুন্দর সন্ধ্যা। বসন্তের পল্লীপথ গন্ধভারাতুর, আর মানুষের মন আবেগ-আকুল সেই গন্ধের উন্মাদনায়। কাঞ্চনমালার ঘরের উঠোনের বাতাবী-গাছটায় অজস্র ফুল—আর তার বুকে অফুরন্ত মধু। কাঞ্চনমালারও! সারাটাদিন ওর যেন মদের নেশায় কেটে গেছে আজ। যেন ও বসন্তের প্রথম ফোটা ফুল, ফোটার আনন্দে বিশ্বকে নূতন চোখে দেখছে। এমনটা ওর জীবনে কখনো হয়নি আর। উঠোনের তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালালো, তারপর শাঁখ বাজালো সানন্দে। আনন্দের কারণটা ওর কাছে অভিনব—অননুভূত। অভিসারিকার আনন্দ ঠিক এমনি হয় কি না, ও জানে না,—হয়তো ওর আনন্দ তার থেকেও বেশি।

সবই সুন্দর, শুধু একটা মস্ত "কিন্তু" মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। ওটা নিশ্চয়ই সংস্কার—বহুদিনের অভ্যাস এবং বহুশ্রুত সতীত্বের কাল্পনিক ছায়া—ওটা অন্য কিছু নয়। কাঞ্চন নিজকে দৃঢ় করে নিল। অন্ততঃ দৃঢ় করতে চেষ্টা করতে লাগলো। অভয় ঘরেই আছে, কিন্তু সে বাইরে যাবে, তার ব্যবস্থা করছে। সে বাইরে গেলে তবে কাঞ্চনের আশা পূর্ণ হবে। হবে কিনা, কে জানে? কাঞ্চন এই সব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা সারল। অভয়ের জন্য খানকয়েক লুচি ভেজে দিতে হবে। ময়দা মাখা আছে। কাঞ্চন রান্নাঘরে বসলো এসে। গরম গরম লুচি খাবার জন্য অভয়ও বসল এসে। দু একটা গেঁয়ো রসিকতা করবে আর খাবে, এই ইচ্ছা অভয়ের। এরকমটা প্রায়ই করে

সে। সারারাত বৌকে ছেড়ে অন্যত্র বাস করার জন্য মনের অগোচরে যে অপরাধ-আশঙ্কা, অভয় এইরকম ভাবে রসিকতার মধ্যে সেই প্রত্যবায়, পাপটা উড়িয়ে দিতে চায়। অর্থাৎ ও জানাতে চায় যে কাঞ্চনকে ও যথেষ্ট ভালবাসে—যেতে হচ্ছে, নেহাৎ না গেলে নয় বলেই। কাঞ্চন সবই বোঝে—আগে আগে দু'চারবার প্রতিবাদও করেছে, কিন্তু আজ নিঃশব্দে হাসিমুখেই খাবার সাজিয়ে দিল, শুধু বললো,

—মশায়ের ফেরা হবে রাত কটার সময় ?

—নাঃ, আজ বেশি রাত হবে না! বালিকাবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি তৈরী হবে কি না—না গেলে হয়তো আর কেউ সেক্রেটারী হয়ে যাবে।

কাঞ্চন জানে—মিছে কথা। বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী সে হয়েছে। এখন যাবে লুটনীদের বাড়ী। সেখানে তাড়ি খেয়ে রাত কাটাবে। কিন্তু কাঞ্চন সুবোধ বালিকার মত হাসলো।

—সেক্রেটারী হলে তোমাকে কত টাকা দিতে হবে ?—শুধুলো কাঞ্চন।

—টাকা! টাকা আমি খুব কমই দিই কাঞ্চন। বুদ্ধি থাকলে বরং—টাকা রোজগার করা যায় এসব ব্যাপারে। আমি সেই ফন্দিতেই ঘুরছি!

হাসলো কাঞ্চন অভয়ের হাসির প্রতিধ্বনি করে। হ্যাঁ, বুদ্ধি অভয়ের যথেষ্টই আছে। সে খবর কাঞ্চনের অজানা নয়, কিন্তু কাঞ্চনের বুদ্ধি কতখানি, সেটা তো অভয়ের জানা নেই। নির্ব্বোধ

স্বামীর আত্ম-প্রশংসা শুনে আর একবার হাসলো কাঞ্চন ওর অলক্ষ্যে। খেয়েই অভয় বেরিয়ে গেল। বলে গেল,—দরজা বন্ধ করে যাও। আমি এসে ডাকলে খুলে দিও।

কাঞ্চন ওর পিছন পিছন এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ঘরে ফিরে লণ্ঠনের আলোটা আরো উস্কে দিয়ে দেখলো নিজেকে একবার। একখানা সাবান বার করে হাতে মুখে আবার ঘষলো। স্নো-পাউডার মাখলো, গয়নাগুলো পরলো,—শাড়ীখানা দু'তিন রকম ছাঁদে পরলো; কোন্ রকমে মানাচ্ছে ভালো?—সাজ সজ্জা করতে করতে মনের আনন্দটা কিন্তু উৎকণ্ঠায় পরিণত হচ্ছে। রাত হয়ে এল অনেকটা।

এই বিলম্ব হয়তো মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণার দান! এই অপেক্ষমানতার অবসরে আত্মশুদ্ধির একটা আশ্চর্য্য প্রেরণা যেন পেতে লাগলো কাঞ্চন। স্বামীর উপর তার সঞ্চিত আক্রোশ যেন অনুরাগে পরিণত হয়ে উঠছে, যেন মনে হচ্ছে, অভয়ের জন্য এমন করে সাজসজ্জা করে কৈ সে তো কোনো দিন অপেক্ষা করেনি! এমন করে তো অভয়কে মায়াডোরে বাঁধবার চেষ্টা করে নি কখনো কাঞ্চন। করলে হয়তো সে অভয়কে বেঁধে রাখতে পারতো এবং চেষ্টা করলে এখনো পারে। আজ সে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে তার স্বামীর উপর, কিন্তু আগামীকাল সেই অকর্ত্তব্য যে অতিমাত্রায় নিষ্ঠুর হয়ে তারই সতীত্বগৌরবকে লাঞ্ছিত করবে ধরার ধূলায়,—মনের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার জন্য কাঞ্চন একথাটা একবারও ভাবলো না কেন?'

কিন্তু এখনো সময় আছে, কাঞ্চন সামলে যাবে। কাঞ্চন

খুলে ফেললো সাজসজ্জা,—নিতান্ত সাধারণ হয়েই কাঞ্চন খেতে বসলো—তার পবিত্রতা এবং সতীমাহাত্ম্য সে অক্ষুণ্ণই রাখবে; কাঞ্চন মন স্থির করে ফেললো। বহু যুগার্জিত সংস্কার ওর মনে সুদৃঢ় হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তে। যে ভুল সে করতে যাচ্ছিল স্বামীর উপর রাগ করে, সেই ভুলটাই এখন স্বামীর উপর অনুরাগ জাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু অনেকটা এগিয়ে পড়েছে সে, এখন ফেরা কঠিন।

শান্ত পল্লী সুপ্তিতে প্রশান্ত হয়ে যাচ্ছে। দূরে গ্রামপ্রান্তে শিবারব—তার সঙ্গে কুকুরগুলোর চীৎকার—কে জানে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো কাঞ্চনের।

দরজায় করাঘাত! কে? আস্তে উঠে এসে কাঞ্চন দরজা খুলে দিল—গভীর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অম্বুজ—হাতে একটা টর্চ, কিন্তু সেটা জ্বালানো নেই।

—অভয় কোথায়?—বলতে বলতে অম্বুজ ভেতরে ঢুকলো।

—গেছে বাইরে।—বলে দরজা বন্ধ করবে কিনা, ভাবছে কাঞ্চন।

মানুষের অদৃষ্টে কখন কি হয়, কারো জানা নেই। যে কাঞ্চন এই দীর্ঘ দুটো বছর এই গ্রামের পরম লক্ষ্মীমন্ত বধূ হিসাবে সম্মান পেয়ে আসছে—তার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে আজ অন্ধকার আকাশে তারার দল বুঝি বিকট হাসি হাসছিল, আর হাসছিল নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-দেবতা। কে জানতো তার নিষ্ঠুর বজ্র উদ্যত হয়েছিল কাঞ্চনের জীবনের অমন একটা প্রলয়ঙ্কর মুহূর্ত্তকে ধ্বংস করে দেবার জন্য! অদৃষ্ট বড় নিষ্ঠুর। মানুষের

কর্ম্মফল তিনি ওজন করে দিয়ে যান—কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক।

খুব বেশীক্ষণ নয়। কাঞ্চন আর অম্বুজ উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, —বাইরের বিশ্বজগৎ ওদের কাছে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তখন, কিন্তু বাইরে তখন চলছে প্রলয়ের প্রথম আভাস,—ওরা জানতেই পারলো না।

দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অতিবৃদ্ধি ঘটেছে। মানুষের অধর্ম্ম এবং স্বার্থপরতার সুযোগ নিয়ে মাটি-মা'কে ছিন্ন-বিছিন্ন করবার জন্য বিদেশী শাসকের দীর্ঘদিনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। ভাই-এর বুকে ভাই ছুরি বসাতে তিলমাত্র দ্বিধা করছেনা আজ। একবারও ভেবে দেখছে না—বিদেশী শাসনের অবসান ঘটলেই ওরা আবার এক মাতার সন্তান বলে পরস্পরকে চিনতে পারবে। কিন্তু ওরা যাই করুক —কতকগুলি গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের বড় বেশি সুযোগ ঘটে যাচ্ছে। নিরীহ, নির্ব্বিরোধী মানুষের বুকে ছোরা চালিয়ে তারা বেশ কিছু রোজগার করে নিল। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা এ গাঁয়ের লোকেরও অজানা নেই—এবং তার প্রথম প্রস্তুতি হিসাবে আত্মরক্ষামূলক কিছু ব্যবস্থাও ওরা করেছিল। কিন্তু ভেদে বিভেদে সারা দেশটাই যখন বিচ্ছিন্ন, তখন এই গ্রামেই-বা একতা থাকে কেমন করে? সেটা অসম্ভব। কারণ এই গ্রামেরই একপাড়া কংগ্রেসী, একপাড়া ফরওয়ার্ড ব্লক, একপাড়া হিন্দু-মহাসভা এবং অন্য একপাড়া স্তোসালিষ্ট—এ ছাড়া কমিউনিষ্টও আছে।

অম্বুজ নবাগত, কাজেই অত খবর রাখে না—কাঞ্চনের মাথায় ওসব বড় বড় থিওরী ঢোকে না। ওরা নিশ্চিন্তই ছিল বাইরের বিপদ সম্বন্ধে কিন্তু আকস্মিক রসভঙ্গের মত একটা বিকট চীৎকার, তার সঙ্গে করুণ ক্রন্দন ওদের আতঙ্কিত করে দিল। অম্বুজ এক লাফে এসে উঠোনে দাঁড়ালো—কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। গোলমালটা একেবারে অভয়েরই বাড়ীর সামনে। অম্বুজের হৃৎকম্প হতে লাগলো কিন্তু আত্মরক্ষার কোনো উপায় তখন আর ও দেখতে পাচ্ছে না।

দুমাদুম্‌ সদর দরজায় আঘাত। কাঞ্চন ছুটে এসে ধরলো অম্বুজকে। কিন্তু অম্বুজ শুধু ভীরু নয়, কাপুরুষ। বিপন্না নারীকে রক্ষা করবার চেষ্টা না করে অম্বুজ তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গোয়ালের ভেঁতর ঢুকলো গিয়ে—দু'তিন জন ডাকত তখন দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছে। নিঃশব্দে ওরা এসে ধরলো কাঞ্চনকে। ভয়ে স্তব্ধ কাঞ্চন—সর্ব্বাঙ্গে যেন সাড় নেই। লোকগুলো ঐ আমতলাতেই কাঞ্চনের সর্ব্বস্ব অপহরণ করলো।

কিন্তু অম্বুজ! গোয়াল থেকে গরু বের করবার যে ছোট দরজাটা বাইরের সরু গলির মধ্যে পড়েছে, সেইটা খুলে ছুটতে লাগলো রাস্তার উপর। চীৎকার আর ক্রন্দন মিশিয়ে গ্রামের আকাশ তখন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

দলবদ্ধ গ্রামবাসীরা যে-যার লাঠি-সড়কী নিয়ে বেরিয়েছে ডাকাতদের বাধা দিতে। বাবুদের বাড়ীর চারটা পালোয়ান দারোয়ান

ভীম বিক্রমে লাঠি ঘোরাচ্ছে—কিন্তু বাতাসেই। ডাকাতদের কাছে কেউই এগুচ্ছে না। আপন-আপন ঘরের রক্ষাকার্যেই বেশীর ভাগ লোক নিযুক্ত। কিন্তু এমনি করে ওদের মনকে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে যে ডাকাতরা যে একঘরে আক্রমণ শেষ করে অন্য ঘরকে বাদ দেবে না—একথা কেউ ভাবছে না।

কিন্তু একজন ভাবলো,—রোহিত। সে তখনও ঘুমায়নি, পড়ছিল। অকস্মাৎ অস্বাভাবিক চীৎকার শুনেই লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লো। পাড়ার কয়েকটা ছেলেও বেরুলো—ক্রমে অনেকেই এসে যোগ দিল।

আক্রমণটা নিশ্চয়ই বাবুদের বাড়ীতে হবে—এই ভেবে রোহিত তার দল নিয়ে এসে দাঁড়ালো প্রণব চাটুজ্যের তমালতলায়; —অসংখ্য ভাঙ্গা ইট কুড়িয়ে ওরা ছুড়তে পারবে এখান থেকে। কিন্তু ডাকাতরা কোন্ দিকে, সেটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে হরিজন-পল্লী থেকে বেশ বড় একটা দল আসছে এগিয়ে—তাদের হাতে বড় বড় লাঠি—তীর-ধনুক, ছোরা-বর্শা, 'মার মার' করে এগিয়ে আসছে ওরা।

দুর্বৃত্তদের ইচ্ছা ছিল, গ্রামের মাঝখানে আক্রমণ করে ওরা সারা গ্রামটাকে অকস্মাৎ ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তার পর সুবিধামত যে কোনো ঘরে ঢুকে লুঠ করবে। ইতিমধ্যে কয়েকজন বেরিয়েও পড়েছে বাবুদের বাড়ীর দিকে। উপর থেকে সত্যভামার স্বামী বন্দুক ছুড়লেন—একটা, দুটো পরপর আওয়াজ হয়ে গেল। ইংরাজের অস্ত্র, মানুষ ওকে যমের মত ভয় করে।

রুক্মিণী, সত্যভামা ইত্যাদি মেয়ের দল ছাদে উঠে গেছে।

অকস্মাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো নাতিদূরে একটা ঘর, তারপর আর একটা, তারপরও আর একটা। উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গেল গ্রামখানা।

অতি বুদ্ধিমানরা অনেক সময়েই নির্ব্বোধের মত কাজ করে বসে। চাঁদ না ওঠার জন্য অন্ধকারে যে সুবিধাটা ডাকাতরা পাচ্ছিল তার পথে ওরা নিজেরাই কাঁটা দিল আগুন লাগিয়ে। হরিজন-পল্লীর শতাধিক লোক ওদের দেখতে পেল--অভয়ের বাড়ী আর তার কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ী জ্বলছে।

মার্‌মার্‌ শব্দে ওরা ছুটলো সেই দিকে। অম্বুজ ঐ পথেই ছুটে পালাচ্ছিল—সামনে পড়ে গেল ওদের! ভয়ে প্রায় সে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা ওকে চিনেই বললো, —কোন্ দিকে, কোন্ দিকে ?

—ঐ দিকে—অভয়ের বাড়ীতে—বলেই সাহস সঞ্চয় করে অম্বুজ ওদের দলেই ভিড়ে গেল। ভিড়ে যেতে বাধ্য হলো অম্বুজ, কারণ ওর বাড়ীর দিকে পালাবার পথ আগলে রয়েছে দুর্বৃত্তেরা; তাছাড়া ওর বাড়ী অনেকটা দূরে; পথে বিপদ ঘটবে কিনা জানা নেই, তাই অম্বুজ ঐ দলের মধ্যে নিজকে নিরাপদ ভাবলো। সংখ্যায় ডাকাতরা কত, জানা নেই কিন্তু গ্রামের লোকেরা চার পাঁচ শ'। ওদিকে বড় বাবু আরো কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ করলেন।

ওদিকে তমালতলায় রোহিতের দল ইষ্টক খণ্ড ছুঁড়ছে। এদিকে গ্রামবাসীরা তীর—শড়কী আর ইটপাটকেল ছুড়ছে; ডাকাতগুলো বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেল। ঘরের আগুনের

উজ্জ্বল আলোক ওদের সব সুবিধা নষ্ট করে দিল। তা ছাড়া আর একটা মস্ত বিপদ যে, যে-ঘরগুলোতে ওরা আগুন লাগিয়েছে, ওরা এখনো তারই কাছাকাছি আছে। পালাতে না পারলে ওরাই আগে পুড়ে মরবে—কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে ওরা পালাবার পথ বেছে নিল।

গোয়াল ঘর থেকে বেরুবার পথে হোঁচট-লেগে অম্বুজের ডান পা'টা একটু জখম হয়েছে, সে খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু হরিজনদের মধ্যে সে বেশ নিরাপদ যায়গায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চীৎকার করছে,—চালাও—বন্দে মাতরম্—জয়হিন্দ্....পাকড়ো শালা লোক কো... !!

ঘর পোড়ার আগুনে ওর সেই বীর মূর্ত্তি দেখলো রুক্মিণী বাড়ীর ছাদ থেকে! আশ্চর্য্য হয়ে গেল সে। সত্যি কি অম্বুজ এতখানি সাহসী?—এমন বীর! দেশ মাতার এমন যোগ্য সন্তান সে?

ছোট্ট একটা বাঁশের বাখারী কুড়িয়ে নিয়ে অম্বুজ চীৎকার করছে,

—এগিয়ে চলো ভাই সব। জান দেঙ্গে, মান নেহি দেঙ্গে...

উঃ! বাঁখারীটা সেই প্রাচীন ক্ষাত্রযুগের বীরের তরবারির মত দেখাচ্ছে। রুক্মিণী মুগ্ধ হয়ে গেল—মনে করতে লাগলো, এই ছাদ থেকেই ওর গলার হারছড়াটা ছুড়ে দিলে অম্বুজের গলায় পড়বে কি না। ফুলের মালা থাকলে আরো ভালো হোত। কিন্তু সেরকম কিছু করবার পূর্ব্বে গ্রামের কতকগুলো লোক দুর্বৃত্তদের পিছু ধাওয়া করলো, আর বাকি অধিকাংশরা

আগুন নিবাবার চেষ্টায় লাগল। খোঁড়া পা নিয়ে অম্বুজ বসে পড়লো একজনের বাড়ীর পিছনের রকে! আহাঃ! রণশ্রান্ত বীর যেন! রুক্মিণীর অন্তরে সত্যিকার মমতা জাগছে এবার।

কনট্রোলের জিনিষপত্র সম্বন্ধে গ্রামের বহুলোকের রাগ রয়েছে অভয়ের উপর—কাজেই লোকগুলো আগে যাচ্ছে অন্য বাড়ীগুলোর আগুন নেবাতে; সবারই যেন ইচ্ছা,—অভয়-শালার বাড়ীটা পুড়ুক....বেশ হচ্ছে! কিন্তু রোহিত এসে বললো—তিন দলে ভাগ হয়ে যাও—এক সঙ্গে তিনটে ঘরের আগুনই নিবিয়ে না ফেললে গ্রাম সামলানো যাবে না, কারণ একঘরের আগুন অন্য ঘরে ছড়িয়ে পড়বার বেশি সম্ভাবনা।—উপর থেকে সত্যভামার স্বামীও সেই কথাই বললেন, এবং নিজেও অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য নেমে এলেন। গ্রামের মেয়েদের নিয়ে রাকা কলসী কাঁখে জল বইতে আরম্ভ করলো কাছের শিবপুকুর থেকে। রুক্মিণীও সেই দলে যোগ দিল এসে।

তিনটে ঘরে আগুন জ্বলছে—তিনটে ঘরেই যথাসাধ্য তাড়া-তাড়ি জল ঢালা হচ্ছে—অম্বুজ খোঁড়া পা নিয়ে উঠে—"এদিকে জল, ওদিকে জল"—করে চেঁচাচ্ছে। একজন জিজ্ঞাসা করলো, —তোমার পায়ে লাগলো নাকি?

—আমিই তো প্রথম শহিদ। একখানা বর্ষা এসে লাগলো পায়ে!

কথাটা শুনলো রুক্মিণী এবং রাকা এবং আরো অনেকেই। আহা! বীর অম্বুজের পায়ে সর্ব্বাগ্রে ওষুদ দেওয়া উচিৎ ওদের; কিন্তু বীরবর চীৎকার করছে—জল—জল—জল আনো!

আগুন কিঞ্চিৎ আয়ত্তে এলে অভয়ের বাড়ীর ভেতর ঢুকলো কয়েকজন লোক। লাইব্রেরী ঘরটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে এবং রান্নাঘরটা পুড়ছে, কিন্তু উঠোনে আমতলায় ও কে? বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত, লুণ্ঠিত একটা নারীদেহ! ভয়ে মূর্চ্ছা গেছে নাকি? না! সকলে মুহূর্ত্তেই বুঝলো ব্যাপারটা। অভয়ও এসে পড়েছিল এর মধ্যে। বৌএর মাথাটা কোলে নিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো—কিন্তু দেখা গেল, কাঞ্চন বেঁচে আছে।

নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ডের ভস্মস্তূপ থেকে বার করে আনা হোল কাঞ্চনের অর্দ্ধমূর্চ্ছিত দেহখানা। কিন্তু একা কাঞ্চনই নয়, আরো তিনটি মেয়ে অনুরূপ ভাবেই নির্য্যাতিতা হয়েছে। তাদের একটি বিবাহিতা, অপর দুটি কুমারী। একটি মেয়ে অগ্নিতে ভীষণ ভাবে দগ্ধ হয়েছে। রাত্রি প্রভাতের দিকে হতভাগীর সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল মরণের শীতল স্পর্শে। বেঁচে উঠলো এরা তিনজন।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপর্য্যস্ত গ্রামখানা বিষাদ-মলিন হয়ে উঠলো। ধন-সম্পত্তি অনেকেরই গেছে। কিন্তু সব থেকে মূল্যবান যে নারীর ধর্ম্ম, তাই লুণ্ঠিত হয়েছে অতি কদর্য্য ভাবে। সময়ে বাধা না দিলে হয়তো সারা গ্রামখানাতে কেউই বাদ যেত না ওদের অত্যাচার থেকে।—যা হবার হয়েছে, এখন এত দুঃখ স'য়েও যারা বেঁচে রইল, তাদের নিয়ে কি করা হবে, তারই চিন্তা গ্রামের সমাজ-পতিদিকে চিন্তাকূল করে তুললো সর্ব্বাগ্রে।

সারাদিন নানান খণ্ড-সভাসমিতি, আলাপ-আলোচনা চললো গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে। বিকালে বসলো সভা। এই সভাতেই স্থির করা হবে, কি করা যাবে ঐ নির্য্যাতিতা মেয়েগুলিকে নিয়ে। সভার আহ্বায়ক সত্যভামার স্বামী এবং অভয় আর অম্বুজ! নির্য্যাতীতা মেয়ে তিনটিকেও এনে একধারে বসানো হয়েছে। দেবীর পূজামণ্ডপে বলির পাঁঠার মত কাঁপছে তারা। শুধু কাঞ্চন এক একবার চোখ তুলে চাইছে অম্বুজের পানে। ঐ ভীরু কাপুরুষ তাকে কি রকম অসহায় অবস্থায় ফেলে কাল পালিয়ে গেছে, সে কথাটা কাঞ্চন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ আজ সারাদিন সে অম্বুজের বীরত্বের প্রশংসাই শুনেছে। সেই নাকি সর্ব্বপ্রথম ডাকাতদলকে বাধা দেয়—তাতে তার পায়ে চোট লেগেছে অথচ সে আঘাত অগ্রাহ্য করেও রীতিমত যুদ্ধ করেছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। হা ভগবান! তুমি কি সত্যি নেই!—ভাবছিল আর গর্জ্জিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল কাঞ্চন অম্বুজের পানে। কিন্তু ভগবান যে এই আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটিয়ে কাঞ্চনের মানসিক অধঃপতনটাকে লোকলোচনের আড়ালে রেখে দিলেন, এর জন্য একফোঁটা কৃতজ্ঞতাও কি কাঞ্চনের অন্তরে সঞ্চিত হচ্ছে না ভগবানের জন্য? হচ্ছে, কিন্তু কাঞ্চন ভাবছে, ভগবান ঐ নারীলোভী কুকুরটাকে কেন আরো কঠিন শাস্তি দিলেন না! উল্টে ওর প্রশংসায় গ্রামের লোকগুলো পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো! তার ইচ্ছে করতে লাগলো—দাঁড়িয়ে

উঠে তারস্বরে চীৎকার করে বলে যে ঐ ভণ্ড কাপুরুষই তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। নইলে কাঞ্চন অনায়াসে কোথাও ছুটে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারতো। আজ যদি সে স্বামী-সংসার থেকে তাড়িতা হয়, তবে তার দুঃখের দায়ীত্ব অম্বুজকেই অর্শাবে। কিন্তু মানুষ নিজের দোষ সম্বন্ধে এমনি অন্ধ থাকে যে কাঞ্চন নিজের পাপমতির কথাটা মোটেই ভাবছিল না। যদি ভাবতো, তাহলে এই সীতা-সাবিত্রীর দেশের আকাশ থেকে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে শ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে তার লজ্জা বোধ হোত। কিন্তু কাঞ্চন ভাবলো ; ভাবলো যে তার স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে আজ এমন অসহায় অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র তার স্বামীই। কাঞ্চন দুরুদুরু বুকে চাইলো অভয়ের মুখ পানে। যদি আর একবার কোনো রকমে ফিরে যেতে পারে তার সেই গৃহ-সিংহাসনে, তাহলে এ জীবনের এই ভুলের সমাপ্তিরেখা সে এইখানেই টেনে যাবে।

সভায় অম্বুজই সব থেকে লম্বা গলা করে বলছে,

—ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েছেই। এখন এই নির্য্যাতীতা, পতিতা মেয়েগুলির কি হবে, আপনারা ব্যবস্থা করুন। ওরা তো কোনো দোষ করে নি। আমাদের সমাজ থেকে ওদের বহিষ্কার করে দেওয়া কি ঠিক হবে? আপনারা ভাল করে বিবেচনা করে স্থির করুন।

সমস্যাটা অত্যন্ত কঠিন এবং জরুরি। এ রকম কাণ্ড এর পূর্ব্বে এ গ্রামে কখনো হয় নি, কাজেই সকলেই তক্ষিভাব

অবলম্বন করে রইল। ঐ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে পাণ্ডিত্য-অভিমত যিনি দিতে পারেন, তিনি প্রণব চাটুজ্যে, কিন্তু তিনি আসেন নি। রুক্মিণীও পর্দ্দার আড়ালে সত্যভামার সঙ্গে বসেছিল; এই হতভাগীদের কি ব্যবস্থা হয়, দেখবার জন্য গ্রামের মেয়েগুলির আগ্রহের অন্ত নেই; ছোটবড় সকলেই এসেছে। শুধু আসেনি প্রণব চাটুজ্যে, রাকা, আর তার মা। রোহিতও আসেনি। গ্রামবাসীদের সকলকেই যখন ডাকা হয়েছে তখন ওদেরও নিশ্চয় ডাকা হয়েছে; কেন ওরা কেউ আসেন নি? সত্যভামার স্বামী পুনরায় ডাকতে পাঠালেন প্রণব চাটুজ্যেকে। এর মধ্যে এদের ছোটখাট বক্তৃতা চলতে লাগলো। কারও মতে ওদের ঘরে নেওয়া উচিৎ, কারও মতে নয়। কিন্তু ওদের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। অথচ ঐ নির্দোষ মেয়েগুলিকে অকারণ ত্যাগ করতে অনেকেই নির্দ্দেশ দিচ্ছেন নির্ম্মম ভাবে।

—তা কি হয় মশায়! সমাজ রাখতে হলে ওদের আর ঘরে নেওয়া চলে না!

—কিন্তু আপনারাই তো বলছেন যে ওরা নির্দ্দোষী—অম্বুজ বললো।

—তা হলে কি হবে, ওদের নিয়তি। ম্লেচ্ছ-স্পর্শের পর কন্যাকে গৃহে রাখা সমাজের পক্ষে ঘোর অকল্যাণকর—এ হ'তেই পারে না—বললো ওপাড়ার হরেকৃষ্ণ রায়।

উনি গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধন-সম্পত্তি ভালই আছে বলে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। ওঁর কথার উপর কারো কথা বলতে

গেলে দুঃসাহস দেখানো হয়, তবু অম্বুজ বলল—ওরা কোথায় যাবে? ওদের জন্য কি ব্যবস্থা করবেন আপনারা?

—তা আমরা কেমন করে জানবো? ব্যবস্থা ভগবান করবেন। ওদের সমাজে স্থান দিয়ে সমাজের মধ্যে পাপ ঢোকাতে বলতে আমি পারবো না।—

হরেকৃষ্ণ রায়—দুর্গা দুর্গা—উচ্চারণ করে গলাটা গম্ভীর করে নিলেন। অম্বুজ কি বলবে, ঠিক করতে পারছে না। কারণ, দেখা গেল হরেকৃষ্ণকে সমর্থন করবার জন্য গ্রামের অনেক বৃদ্ধই ব্যগ্র. এমন কি স্বয়ং অম্বুজের বাবা পর্য্যন্ত। তবু অম্বুজ নিতান্ত মরিয়া হয়েই বললো,

—আপনাদের মতে তাহলে এই নির্দ্দোষ মেয়েগুলিকে সমাজের বার করে দেওয়া হবে? তারপর ওরা কোথায় গিয়ে কি করবে তার ঠিক নেই!

—তুমি ছেলেমানুষ। সমাজের তুমি জান কি—বলে ধমক দিয়ে উঠলেন হরেকৃষ্ণ রায়। অম্বুজের বাবাও তাকে চুপ করতে বললেন। অতঃপর কাঞ্চন এবং আরো দুটি মেয়েকে নিশ্চিত নির্ব্বাসিত করা হবে, ঠিক হয়ে গেল। শুনে রুক্মিণীর বুকখানা ব্যথায় টনটন্ করে উঠছে কিন্তু কি সে করতে পারে এখানে? সত্যভামাকে বললো কানে কানে,

— একি অত্যাচার দিদি? ওরা কী দোষ করেছে যে ওদের ঘর থেকে তাড়ানো হবে?

সত্যভামা কোন উত্তর দিল না। সে জানে; এখানে সমাজ-পতিরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। রুক্মিণী চেয়ে দেখলো,—কাঞ্চন এবং

আর দুটি মেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ওদের সান্ত্বনা দেবার জন্য কেউ ওদের কাছে নেই। রুক্মিণী অকস্মাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে চলে এলো সভার মাঝখানে।

—আমি প্রতিবাদ করছি এই অন্যায় বিচারের—তীব্র কণ্ঠে বললো রুক্মিণী। সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠলো এই অপরূপ সুন্দরী তরুণীকে অমনভাবে দাঁড়াতে দেখে। হরেকৃষ্ণ রায় কিছু বিস্মিত কিছু বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করলেন,

—কোন্‌টা অন্যায় বিচার দেখলে মা তুমি ?

—বিনা দোষে এই মেয়ে তিনটিকে সমাজের বার করে দেওয়ার কি যুক্তি আছে ? আজ আপনার বাড়ীর কোনো মেয়ে যদি এই অবস্থায় পড়তো তো কি আপনি করতেন, বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি ? পরের ঘাড়ে ছুরি চালিয়ে সমাজ রক্ষা করে সমাজপতি সাজতে চান আপনারা—আর আপনাদের এই স্বার্থপরতা আর নির্ব্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে অন্য সমাজের লোকসংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, যার ফলে বাঙালী হিন্দু নিজ বাসভূমে পরবাসী হলো—যার ফলে এই অত্যাচার, উৎপীড়ন—এই উৎসন্নে যাবার পথটি পরিষ্কার হচ্ছে। এই সমাজ নিয়ে অহঙ্কার করতে লজ্জা করে না আপনাদের ? যে সমাজ এমন করে নির্দ্দোষ নারীর দণ্ড বিধান করে করে নিজেকে ক্ষয়-রোগগ্রস্থ করে তুলেছে, সে সমাজ রুগ্ন—তার থাকার আর কোনো দরকার নেই। আমরা নতুন সমাজ গড়ে তুলবো—এই যুগের উপযোগী করে। মনে রাখবেন, সমাজ কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়—তার সম্বন্ধে কথা বলবার আপনার যতখানি অধিকার আছে, আমারও

ততখানি অধিকার আছে এবং এই অত্যাচারিতা মেয়ে তিনটিরও ঠিক ততখানি অধিকার রয়েছে।—রুক্মিণী থামলো।

—ছিঃ মা, ছিঃ, তুমি কেন এখানে? তুমি ভেতরে যাও—ভেতরে যাও—বলতে বলতে অম্বুজের বাবা এগিয়ে এসে এমন ভাবে রুক্মিণীর পিঠে হাত দিয়ে তাকে চিকের দিকে ঠেলতে লাগলেন, যেন রুক্মিণীর উপর পুত্রবধূত্বের অধিকার এর মধ্যেই তাঁর জন্মে গেছে। কিন্তু রুক্মিণী তীব্র কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে উঠলো ফিরে দাঁড়িয়ে,

—ভেতরে যাবার জন্য আমি তো এখানে কনে'বউ হয়ে আসিনি। আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবোই। অত্যাচারিতাকে রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম।

—তোমার ধর্ম্ম জয়যুক্ত হোক মা রুক্মিণী—বলে এসে দাঁড়ালেন প্রণব চাটুজ্যে। সমস্ত সভাটা একমুহূর্ত্তে উচ্চকিত হয়ে উঠলো যেন। উনি বললেন,

—এই ব্যাপারটারই অনুরূপ একটু ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করবার জন্য আমার কিছু দেরী হয়ে গেল, তার জন্য সমবেত মানবমণ্ডলীর কাছে মার্জনা চাইছি...বলে উনি আধ মিনিট থামলেন। ওঁর পিছনে রোহিত এবং চার পাঁচটি যুবকও এসেছে; তারা সভার একপাশে দাঁড়াল।

—আমাকে আহ্বান করার উদ্দেশ্য আমি জানি, কিন্তু আপনাদের সিদ্ধান্ত কি হয়েছে, সেটাও জানা দরকার আমার,... প্রণব চাটুজ্যে বললেন।

সত্যভামার স্বামী সংক্ষেপে জানালেন যে হরেকৃষ্ণ বাবু,

অম্বুজের বাবা এবং আরো কয়েকজন মাতব্বর মেয়েগুলিকে সমাজে স্থান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

প্রণব চাটুজ্যের হাতে হস্তলিখিত একখানা প্রাচীন পুঁথি। তিনি সেটার মধ্যে কয়েক যায়গায় কুশ দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছেন। বললেন,

—সমাজে ওদের স্থান দিতে অনিচ্ছার কারণ কি গত রাত্রের ব্যাপার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—অম্বুজ বললো—মানে, গুণ্ডারা ওদের জাত মেরেছে।

—না, জাত কারো মারা যায় না। আর জাত যদি মারাই যায়, তাহ'লে আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর পূর্ব্বেই মঘ-দস্যুর হাতে আমাদের প্রায় সকলেরই জাত মারা গেছে। কিন্তু সেদিনকার সমাজ আজকার মত পঙ্গু ছিল না, মৃত ছিল না—তার জীবনের লক্ষণ দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত ছিল—বলেই উনি হাতের পুঁথিটা খুললেন। সকলেই অপেক্ষা করতে লাগলো কি উনি বলবেন, শুনবার জন্য।

—এই কুলগ্রন্থের নাম সাঞ্চা—প্রণব চাটুজ্যে বলে চললেন—কূলের গৌরব নিয়ে যাঁদের বংশধরেরা আজ এখানে কথা বলছেন—তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কুল-দোষের কথা—ঠিক এই রকম অবস্থা-বিপর্যায়ের কথা আর তাতে "জাতি ধ্বংশো ন ভবতি"—কথা পরিষ্কার লেখা আছে। ইংরাজি প্রায় ১৬২৫ সালে মঘের দৌরাত্ম আরম্ভ হয় আর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সেই

অত্যাচার চলে। বাংলায় আজ যাঁরা সম্মানিত বংশগৌরব নিয়ে বাস করছেন—এই কূলগ্রন্থ পড়লেই বুঝতে পারা যায়, তাঁদের অনেকেরই বংশের কন্যা এবং বধূ মঘের দ্বারা নীতা হয়েছিলেন। সে ইতিহাস ঘেঁটে জাতি ধ্বংশের হিসাব করতে হলে বহু বংশেরই জাতিকূল আজ বাঁচে না; কিন্তু তখনকার সমাজপতিরা জাতিধ্বংস হতে দেন নি, তাই আজ তাঁদের বংশধর আমরা কূলের বড়াই করতে পারছি;—বলেই উনি মুখ্যো, বন্দ্যো, চট্টো, ধনোচট্টো থেকে আরম্ভ করে বহু বহু বংশের মঘদোষের কথা ঐ পুঁথিতে লিখিত আছে, দেখিয়ে যেতে লাগলেন। উনি লিখিত-রূপে প্রমাণ করে দিলেন যে এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে ঘটেছে। কিন্তু জাতি যায় নি, এবং সমাজে স্থান পেয়েছে সেই মেয়েরা। এর জন্য কারো জাতি ধ্বংস হয় নি এবং আজো হওয়া উচিৎ নয়।

পরে বললেন—আজ এই মৃত সমাজকে পুনর্জীবিত করতে না পারলে আমাদের সকলকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। ভেবে দেখুন—আজ ওদের যা হয়েছে, কাল আপনার বা আমার ঘরে ঠিক তাই ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক। এখন যদি আমরা সমাজকে ঠিক যুগোপযোগী না করতে পারি, তাহলে ওরা বাধ্য হয়ে অন্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে গিয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। তাদের পুত্র কন্যারাও হবে সেই সমাজের লোক। এমনি করে বাংলার হিন্দু আজ লঘিষ্ঠ সংখ্যায় এসে নিজের দেশে নগণ্য হয়ে পড়ছে—তবু এখনো যদি তার ভুল না ভাঙে তবে আর ভাঙবে কবে? সমাজের চৈতন্যকে আজ এই দিকেই জাগ্রত করতে হবে। সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নারী—সে

আমাদের বংশ-রক্ষার ধাত্রী—সমাজ রক্ষার চণ্ডিকা। তার হিরণ্য-প্রতিমা অকারণে আমাদের নিজের দোষে বিসর্জন দেওয়ার মত মূর্খতা আর কিছু নাই, কিছু হতে পারে না।

—আপনার কি মত, ওরা সমাজে সাদরে ঠাঁই পাবে? অম্বুজের বাবা শুধুলেন।

—নিশ্চয়। ঠাঁই ওদের দিতেই হবে—কারণ ওরা নিজেরা শুধু নিরপরাধ তো নিশ্চয়ই, ওদের রক্ষা না করতে পারার জন্য আমরাই অপরাধী।

কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। অম্বুজ বললো,

—কোনো রকম প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তাহ'লে ওদের ঘরে নেওয়ার ব্যবস্থা হোক।

—প্রায়শ্চিত্ত—রোহিত যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—প্রায়শ্চিত্ত তো করা উচিৎ আমাদের; আমরা, যারা সক্ষম পুরুষ হয়ে ওদের রক্ষা করতে পারি নি—সেই কাপুরুষদেরই তো আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।—রোহিতের সঙ্গের দুটি যুবক এগিয়ে এসে বললো,

—আমরা ঐ কুমারী মেয়ে দুটিকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি। ওঁরা অনুগ্রহ করে এসে আমাদের সহধর্ম্মিণীর আসন গ্রহণ করুন।

রুক্মিণী সানন্দে ঐ মেয়ে দুটির হাত ধরে টেনে এনে প্রণব চাটুজ্যের কাছে এসে বলল—এদের আশীর্ব্বাদ করুন। যেন এরা যোগ্য সহধর্ম্মিণী হয়। হাত তুলে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলেন প্রণব চাটুজ্যে।

—তোমরা নিরপরাধ, তোমরা মাতা, কন্যা, বধূ—তোমাদেরি গর্ভের সন্তান ভারতমাতাকে গৌরবান্বিত করুক।

উচ্চ কণ্ঠে রুক্মিণী ধ্বনি করলো—ভারত মাতরম্ বন্দে! সকলেই যোগ দিল ওর সঙ্গে, অম্বুজের বাবা এবং হরেকৃষ্ণ রায় পর্য্যন্ত।

উচ্চ জয়ধ্বনি কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হ'লে সমাজপতিরা সকলেই প্রণব চাটুজ্যের কথা মেনে নিয়েছেন, দেখা গেল, কিন্তু অম্বুজের বাবা প্রশ্ন করলেন,

—এই ভাবে ধর্ষিতা মেয়েদের ঘরে নেবার বিধান দিচ্ছেন আপনি প্রণবদা?

—আমি দিচ্ছি না। উদার হিন্দু শাস্ত্র বহু পূর্ব্বেই এ বিধান দিয়ে রেখেছেন। আমরা শাস্ত্রের কথাগুলো নিজেদের সুবিধামত স্থানেই সুবিধামত ভাবে ব্যবহার করার স্বার্থপরতার জন্যই আজ এতখানি অধঃপতিত। শাস্ত্র তো ঠিক উকীলের জন্য লেখা পেনালকোড্ নয়, সুবিধাবাদী রাজ-নীতিকের সুযোগসন্ধানী 'ইজ্‌ম্‌ও' নয়—শাস্ত্র সমগ্রভাবে বুঝতে হয়—কারণ তার সমগ্রতাই মঙ্গলের পথ-প্রদর্শক—সবটা মিলিয়ে তবে সেটি শাস্ত্র। প্রয়োজন-মত এখান সেখান থেকে দুটো চারটে লাইন তুলে নিজের ভাল-মন্দ মত্ সমর্থন করবার জন্য শাস্ত্র তৈরী হয় নি। তা ছাড়া...

প্রণব চাটুজ্যে অল্প থেমে বললেন—আজকার এই বিপ্লবময় দিনে যদি এই রকম আইন আমরা বিধিবদ্ধ না করি, তাহলে

হিন্দুসমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। উদার শাস্ত্রকারগণ সেকথাও বলে গেছেন ;—যুগের প্রয়োজনে নূতন বিধান আমাদের জারি করতেই হবে এবং যুগে যুগে তাই হয়েছে—যেমন এই মঘদোষের সময় হয়েছিল। হিন্দুধর্ম্মের অধঃপতনের মূলে কতকগুলি স্বার্থপর সমাজনেতার গোঁড়ামী—যার জন্য আজ এই হরিজন আন্দোলন, এই নারী-লাঞ্ছনা আর এই সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতা। এর প্রতিকার অবিলম্বে প্রয়োজন—কিন্তু…

—কিন্তু কি বলুন ?—রুক্মিণী প্রশ্ন করলো।।

—বিদেশী শাসক আজ ভারতকে বিভক্ত করে দিচ্ছে—বাংলাকেও বিভক্ত করে দিচ্ছে। "ডিভাইড্ এণ্ড রুল" নীতিতে তারা আরো শতাব্দিকাল এদেশে রাজত্ব কায়েম রাখবার ব্যবস্থা পাকা করে নিল। 'অভাগী ভারত-মা আমার আজ ছিন্নদেহা,—অগণ্য সন্তানের মুখপানে চেয়ে তিনি শুধু বলছেন—'আমার সারা অঙ্গে তোদের অগণ্য তীর্থ, অসংখ্য স্মৃতি-গাথা, অনন্ত আশ্রয়স্থান,—আমায় তোরা খণ্ড-বিখণ্ড করে ছাড়লি!' ভারতের এই বৈপ্লবিক বিপর্য্যয়ের ক্ষণে স্বধর্ম্মের একটি প্রাণীকে আমরা দলচ্যুত করতে পারি না—করা উচিৎ নয়। ভারতবর্ষ অনন্ত কাল থেকে আমাদের তীর্থ। মাতার এই অঙ্গচ্ছেদ আমাদের পক্ষে মর্ম্মচ্ছেদ স্বরূপ। আবার অখণ্ড ভারতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অন্য কিছুর দিকে নজর দেবার সময় নেই। আপনারা সকলেই আজ এইখানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন যে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আপনারা এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে বেঁচে থাকবেন—মহাভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন।

—আমরা মহাভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই বেঁচে থাকবো—রুক্মিণীর সঙ্গে অন্য সকলেই সমস্বরে যেন সঙ্গীতধ্বনি করলো।

—কাল আমার ছেলে অংশু আসছে—আমি তাকে ঐ একমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেব, সে যেন অখণ্ড মহাভারত প্রতিষ্ঠার জন্যই বেঁচে থাকে।—প্রণব চাটুজ্যের কণ্ঠে সীমাহীন আবেগ। বড় বড় চোখ দুটিতে জলবিন্দু যেন ঝকমক্ করে উঠলো। "বন্দেমাতরম" ধ্বনিটা আকাশে মিলিয়ে যাবার পূর্ব্বেই উনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। সভাও শেষ হয়ে গেল, কিন্তু রুক্মিণী এই নির্য্যাতীতা মেয়েতিনটিকে নিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড লাগিয়ে দিল। সে ওদের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল ঠাকুর ঘরে ;—অন্য সব মেয়েদের ডেকে বললো—ওরা যে আমাদের সমান মর্য্যাদাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সত্যটা স্বীকার করে নেবার জন্য আপনারা সকলে ওদের অভিনন্দিত করুন। বলে সে শাঁক বাজালো। অন্য মেয়েরা উলু দিল এবং কয়েকজন এয়োস্ত্রী মেয়ে কাঞ্চনের সামন্তে নতুন করে সীন্দুররেখা টেনে দিল। সে একটা নতুন রকম উৎসব যেন। কুমারী মেয়েদুটি নিঃশব্দেই রয়েছে, কিন্তু কাঞ্চন ভাবছে—এতখানি সম্মান পাবার কোন্ যোগ্যতাটা তার আছে! আত্মগ্লানিতে ওর অন্তর পুড়তে লাগলো যেন। বাইরে অম্বুজনাথ মহাস্পর্দ্ধায় বক্তৃতা দিচ্ছে—'গত কাল সে ছিল বলেই গ্রামখানা নাকি বেঁচে গেছে'। উঃ! ঐ নির্লজ্জ কাপুরুষের স্বরূপটা কাঞ্চন উন্মোচিত করে দেখাতে পারছে না—এর চেয়ে বড়ো দুঃখ ওর আর কিছু নাই!

উৎসব শেষে অভয়ের হাত ধরেই কাঞ্চন বাড়ী ফিরলো, যেন

বিয়ের পর নববধূ গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে—এমনি মনের অবস্থা ওর! অম্বুজ ওদের দেখতে পেয়ে হাসি মুখে কাছে এসে বললো—বৌদি সতীলক্ষ্মী মেয়ে—ওকে কি ত্যাগ করা যায় অভয়দা!

কে যেন চাবুক মারলো কাঞ্চনের পিঠে। বিদ্রূপ করছে নাকি অম্বুজ! কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চলে আসা ছাড়া ওর আর কিছু করবার নেই! চলেই এল স্বামীর সঙ্গে; সন্ধ্যা তখন উতরে গেছে। কূয়োর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে কাঞ্চন সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজালো—প্রার্থনা করলো—আর যেন তার ভুল না হয়।

পরদিন সকালে রুক্মিণী এল ওর বাড়ী বেড়াতে। কোনোদিন আসে নাই—আলাপই ছিল না বিশেষ। কাঞ্চন ওকে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল, বললো,—আসুন আসুন, আমার এতবড় ভাগ্যি!

কিন্তু রুক্মিণী বিরক্ত হয়ে বাড়ী ছেড়ে এসেছে। আজ সকালেই ওর বাবা এসে পৌঁছেছেন অম্বুজের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক করার জন্য। ওর ভগ্নীপতির সঙ্গে সেই সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হচ্ছে বাড়ীতে। অম্বুজের বাবাও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন গিয়ে। অতএব রুক্মিণীকে অম্বুজের অঙ্কশায়িনীই হতে হবে—এ যেন বিধিলিপি! কিন্তু খারাপ তো কিছু নয়; অম্বুজ সত্যি ভালো ছেলে। তাকে স্বামী রূপে বরণ

করতে রুক্মিণীর খুব এখন আপত্তি নেই। ঠিকমত চালিয়ে নিতে পারলে অম্বুজ ভবিষ্যতে বেশ 'শাইন' করবে—ভাবতে ভাবতে রুক্মিণী বেরিয়ে পড়লো। সত্যভামা শুধুলো—রাকাদের বাড়ী যাচ্ছিস নাকি ?

—না—রুক্মিণী জবাব দিয়েই চলে এসেছে। রাকাদের বাড়ীই যেত কিন্তু অকস্মাৎ মন বদলে ঠিক করলো, কাল-দেখা সেই বৌটি কেমন আছে একবার দেখা উচিৎ, তাই কাঞ্চনের বাড়ী এসে উঠেছে রুক্মিণী।

—ভাগ্য আমারও। কিন্তু কি রকম করে কি ঘটনা ঘটেছিল, আমাকে আপনি ঠিকমত বলুন দেখি—কাগজে রিপোর্ট লিখে পাঠাব।

কাঞ্চন আঁৎকে উঠলো—ওমা, কাগজে এই সব কেলেঙ্কারীর কথা লেখে নাকি ! ছি ! ছি !

—লেখে। লেখা উচিৎ। আপনার ঘরে যখন গুণ্ডারা ঢুকলো তখন আপনার স্বামী কোথায় ছিলেন ? ছিলেন তো ঘরে ?

কাঞ্চন কিছুক্ষণ উত্তর দিতে পারলো না ; দেখলো, অভয় কোথায় বেরিয়েছে। লাইব্রেরী ঘরটার পোড়া দেওয়ালগুলো মৃত দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমগাছটার পাতাগুলো উত্তাপে ঝলসে গেছে এবং তার সঙ্গে কাঞ্চনের অন্তরটাও ঝলসে গেছে।

—উনি ছিলেন না, বাইরে গিয়েছিলেন—কাঞ্চন শেষে বলল।

—আপনি তাহলে একাই ছিলেন ?—রুক্মিণী আবার প্রশ্ন করলো।

—একা! হ্যাঁ, একাই ছিলাম—কাঞ্চন হাসলো একটু—নইলে কি অমন ভাবে অত্যাচার করতে পারে!—কাঞ্চন সামলে গেল অম্বুজের উপর রাগটা—বললো—,

—ও থাকলেই বা কি হোত বলুন? চার চারটে মস্ত মস্ত গুণ্ডা, একা ও কি করতো?

সত্যি কথা! কিন্তু রুক্মিণী আরো অনেক কথা খুঁটিয়ে জানতে চাইল, কাঞ্চন কিন্তু আর কিছুই বলতে পারলো না, শুধু বললো, যে, গুণ্ডারা আক্রমণ করার পরই সে অজ্ঞান হয়ে যায়—তারপর জ্ঞান হলে দেখে বহু লোক তার পরিচর্যা করছে। রুক্মিণী ওকে দেখে আবার বেরুলো বাকি দুটি মেয়েকে দেখবার জন্য। সদরের কাছে লাইব্রেরী ঘরটা ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে। একবার ফিরে দেখলো রুক্মিণী। রাকার কাছে সেই লাইব্রেরীর কথা শুনেছিল, ইচ্ছা ছিল, কিছু ডোনেশন দিয়ে যাবে। কিন্তু রুক্মিণী তো এখন এই গ্রামেরই বধূ হয়ে যাবে,—ডোনেশন কিছু দিয়ে আবার লাইব্রেরীটা চালু করবে সে।

বাইরে বেরিয়ে রুক্মিণী রাস্তায় পড়তেই দেখতে পেল, অম্বুজ আসছে। নিজকে আর অম্বুজের কাছে এমন অকস্মাৎ প্রকাশ করবার ইচ্ছা নাই রুক্মিণীর, কারণ বিয়ের গাঁঠছড়া যখন বাঁধতেই হবে ওর সঙ্গে তখন দেখাশোনাটা শুভদৃষ্টির সময় হওয়াই বাঞ্ছনীয়—অন্তত এমকম ভাবে পথে-বিপথে দেখা করা নিশ্চয় উচিৎ নয়।

অভয়ের গোয়ালঘরের দিকে ছোট গলিটার মধ্যে চট্ করে ঢুকে গেল রুক্মিণী, মাথায় খানিক ঘোমটা দিয়ে। অম্বুজ দূরে থেকে দেখে ভাবলো, গ্রামের কোনো বধূ হবে। অভয়ের বাড়ীর সামনে এসে একটু ইতস্ততঃ করলো, কেউ কোনদিক থেকে তাকে দেখছে কি না, দেখলো, তারপর—অভয়দা—বলে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। রুক্মিণী এক মিনিট আগেই দেখে এসেছে, অভয় বাড়ীতে নেই, অথচ অম্বুজ ঢুকলো তাকেই খুঁজতে। নারীমনের এক আশ্চর্য্য সন্দেহ-প্রবণতা এবং কৌতূহল ওকে অভিভূত করে ফেললো। গলির ভেতরদিকে একটু এগিয়ে গোয়ালের দরজাটার কাছে দাঁড়ালো রুক্মিণী; শুনতে পেল,—

—লজ্জা করলো না আবার মুখ দেখাতে!—কাঞ্চনের কণ্ঠে সুতীব্র ভৎর্সনা!

—না—না লক্ষ্মীটি, মাফ্ করো! আমি ভেবেছিলাম, তুমিও আমার সঙ্গেই পালিয়ে যেতে পারবে। তুমি যে ওদের হাতে পড়েছ, তা আমি মোটে টের পাইনি!

—ওঃ! টের পাওনি! কাঞ্চন বিদ্রূপ করলো।—তা ভালই হয়েছে, এখন তো টের পেয়েছ। এখন যাও দেখি। এ বাড়ীতে আর এসো না। সর্ব্বনাশ যা হবার তা হয়েছে,—ভগবান শাস্তি নিজের হাতে দিলেন। এখন যাও এখান থেকে।

বলেই কাঞ্চন যেন নিজেই রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে। অম্বুজ বলল,

—কিন্তু আমি না থাকলে তুমি আজ এই ঘরে ফিরতে

পারতে না কাঞ্চন। আমিই সভা ডেকে তোমাকে ঘরে নেবার ব্যবস্থা করেছি—নইলে বাজারে যেতে হোতো!

—কিন্তু আমি তার জন্যও তৈরী ছিলাম—কিন্তু তুমি এখন যাও দেখি—বলে কাঞ্চন রান্নাঘর ঝাঁট দেওয়া ঝাঁটাটা হাতে নিয়ে যেন তাড়া করে এল।

—আচ্ছা, আমি চললুম, কিন্তু মনে রেখো, এর ফল পাবে—বলে অম্বুজ তাড়াতাড়ি পথে নামলো এসে—তারপর কোনদিকে যাবে, ভাবছে—ঠিক সেই সময় গলি থেকে বার হয়ে রুক্মিণী সোজা এসে দাঁড়ালো ওর সম্মুখে।

—বাঃ! যুদ্ধ জয় করে এলেন যে! জয়মাল্য গাঁথবো নাকি?

সুস্পষ্ট সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ রুক্মিণীর কণ্ঠে। তড়িতাহতের মত অবশ হয়ে রইল অম্বুজ কয়েকটা মুহূর্ত্ত। কিন্তু রুক্মিণী ওর কাছ থেকে কোন কথা শুনবার পূর্ব্বেই প্রস্থান করেছে।

শ্বাসরুদ্ধ হয়েই যেন বাড়ী এসে পৌঁছাল রুক্মিণী। এসে দেখলো, ওর বাবা এবং ভগ্নীপতি আর অম্বুজের বাবা তখনো বসে নানান কথাবার্ত্তা কইছেন। রুক্মিণী একেবারে ভৈরবী মূর্ত্তিতে এসে ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বললো—আমার বিয়ে সম্বন্ধে কোনো কথা আপনারা কইবেন না; আমার এখন বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই।

বলেই চলে গেল রুক্মিণী। ওর বাবা এক মিনিট চুপ করে চেয়ে থেকে বললেন—'আদর পেয়ে পেয়ে অমনি হয়েছে। যাক—ওর কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব আজকালকার মেয়েরা বলে। ওদের কথা শুনলে শতকরা সাড়ে নিরানব্বইটা মেয়ে কুমারী থেকে যাবে।—অম্বুজের বাবা বলেন কথাগুলো। ওঁর বিশেষ পছন্দ হয়েছে রুক্মিণীকে, এবং ওঁর দৃঢ় ধারনা যে অম্বুজের মত ছেলেকে বিয়ে করতে কোনো মেয়েরই অপছন্দ হওয়া উচিৎ নয়।

কিন্তু রুক্মিণী নিজের ঘরে গিয়ে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। যে অম্বুজকে সে বীর, মহান, সমাজ হিতৈষী এবং ত্যাগী যুবক বলে ভাবছিল, তার সম্বন্ধে সমস্ত উচ্চধারণা তার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ভগবান আছেন, তাই রুক্মিণী আজ অকস্মাৎ অম্বুজের সত্য স্বরূপ জানতে পারলো।

কিন্তু বাবা দাদার নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে অম্বুজকে। এখন রুক্মিণীর আত্মরক্ষার উপায় কি? ঝগড়া-ঝাটি করে একটা কেলেঙ্কারী করবার মত মেয়ে সে নয়—তাও আবার কুটুম্ব-বাড়ীতে। কি কুক্ষণেই যে রুক্মিণী এখানে এসেছিল! দুশ্চিন্তায় রুক্মিণী ছটফট করতে লাগলো বিছানায় শুয়ে।

অনেক বেলা হয়ে গেছে। সত্যভামা ডাকতে এল ওকে,

—আয়, খাবি!

—না দিদি, জ্বর হয়েছে হয়তো! শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

গায়ে হাত দিয়ে সত্যভামা দেখলো, গা গরম নাই, কিন্তু রুক্মিণী কিছুতেই খেতে উঠলো না—শুয়েই রইল, বলল, খিদে নাই! ওর বাবা এসে বললেন,—তোর যদি মতামত হয় তো দেবনা বিয়ে; আয়, খেয়ে নে! ছেলেটি ভাল, তাই আমরা চেষ্টা করছি।

—ভাল তো নয়ই বাবা, অত খারাপ ছেলে পৃথিবীতে কমই আছে। ও চরিত্রহীন, লম্পট ; শুধু তাই নয়, ও বিশ্বাসঘাতক।

রুক্মিণী কেঁদে ফেলল একেবারে। বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—তা হলে থাক মা, এখানে দেব না তোর বিয়ে।—আশ্বস্ত হয়ে রুক্মিণী খেতে গেল। ওর বাবা নিশ্চয় ওর অমতে বিয়ে দেবেন না,—রুক্মিণী জানে।

কিন্তু রুকিণীকে বিয়ে করতে হবে! ওর বাবা দাদা মা কিছুতেই বিয়ে না দিয়ে ছাড়বেন না, এ সত্য রুকিণীর ভালই জানা আছে। ওঁদের বর্ত্তমান কলকাতার আচার-ব্যবহার যতই প্রগতিপন্থী হোক,—অন্তরে অন্তরে ওঁরা প্রাচীনপ্রন্থী, অর্থাৎ মেয়েকে আইবুড়ো রেখে তার জীবনটা মরুভূমি করে দেবার পক্ষপাতী নন। প্রত্যেক নারী বিবাহিত জীবনের মহান আশ্রয়ে এসে সৃষ্টি করবে সুন্দর একটি সংসার—যুগের যোগ্য করে লালন করবে তার সন্তানকে—তারপর একদিন সেই সন্তানদের সুমহান পরিবেশের গৌরবোজ্জল মন্দিরে গৃহদেবীরূপেই সে দেহত্যাগ করবে…নারীজীবনের এই উজ্জল চিত্র ওঁদের মানসলোকে দীপ্ত আছে বলেই বড়মেয়ে সত্যভামাকে ওঁরা পল্লীগ্রামে দিতে দ্বিধা করেন নি। রুকিণীকেও ঐ একই উদ্দেশ্যের অনুপ্রেরণায় এই গ্রামের বধূ করে নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু রুকিণী যে কয়টা কথা শুনলো কাঞ্চন-নামক ঐ বধূটির মুখে, তাতেই অম্বুজের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে-বধূ-জীবন প্রত্যেক নারীর বরনীয়, তার

সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ বর। কিন্তু অম্বুজ কি রুক্মিণীর বর হবার যোগ্য আছে আর……নাই !

রুক্মিণী মন স্থির করে ফেললো—অম্বুজকে বিয়ে সে কিছুতেই করবে না…বাবা দাদার সঙ্গে যতই বিরোধ বাধুক তার…। কিন্তু বিয়ে তাকে করতে হবে। আর পাঁচজন শহুরে মেয়ের মত বক্তৃতা দিয়ে দেশোদ্ধার করবার জন্য বা মাষ্টারনী হয়ে বিদ্যা বিতরণ করবার জন্যে তার বাবা-দাদা তাকে মানুষ করছেন না। ওঁদের মত—যা কিছু করতে চাও, স্বামীর সঙ্গে মিলেমিশে কর গিয়ে…এমন কি স্বদেশীয়ানা পর্যন্ত।

কিন্তু রুক্মিণীর মন আজ যে উচ্চ সুরে বাঁধা রয়েছে, সেখানে গান বাজাবে কে? প্রণব চাটুয্যের সান্নিধ্যে না এলেই ভাল করতো রুক্মিণী। কিন্তু প্রণব চাটুয্যে তো তাকে কিছু মন্দ শিক্ষা দেন নি! তাঁর আদর্শনিষ্ঠা, অকুতোভয়তা আর আত্মবিশ্বাস রুক্মিণীকে নতুন মানুষ করে তুলেছে এই কদিনেই। নিজকে ওঁর আদর্শে দান করতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যাবে রুক্মিণী…কিন্তু কেমন ক'রে তা হবে! রুক্মিণী যেন নৈরাশ্যের পাথারে ডুবে যাচ্ছে—আজ ওর মনের মনিকোঠায় বারবার জেগে উঠছে প্রণব চাটুয্যের গভীর কণ্ঠস্বর…যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো দর্পো ব্যপোহতি।…

রুক্মিণী বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ পড়ে রইল। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর ওকে স্তব্ধ করে রেখেছে ; ওর মনের অস্থিরতা যেন স্থির হয়ে গেছে আশাহীনতার অন্ধকারে। কিন্তু নিরাশ হয়ে নিজকে নিশ্চিন্তভাবে হত্যা করবার মত মেয়ে আর নেই রুক্মিণী। প্রণব

চাটুয্যের আদর্শ-নিষ্ঠার প্রেরণায় ওর জীবন আজ জাগ্রত হয়েছে নবযৌবনের শক্তিতে—যে শক্তি অন্তরের গোপনপুরে ছিল সুপ্ত। সেই শক্তিকে সে আজ কোথায় রাখবে, ঠিক করতে পারছে না—কিন্তু ঠিক করে দেবার মত গুরু তো রয়েছেন এখানেই—স্বয়ং প্রণব চাটুয্যে।

রুক্মিণী উত্তেজনায় উঠে পড়লো—কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্ত-সংযত করলো নিজেকে। উচ্ছৃঙ্খলতা তার গুরু প্রণব চাটুয্যের আদর্শ-বিরুদ্ধ! এবং যৌবনেরও সেটা ধর্ম্ম নয়। জাগ্রত যৌবনশক্তি সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত না হলে অনর্থ ঘটতে পারে, প্রণব চাটুয্যের এই উক্তি মনে পড়লো রুক্মিণীর।

বেলা অপরাহ্ন হয়ে গেল; ওর বাবা দিবানিদ্রা থেকে উঠে জলযোগ করলেন। অম্বুজদের বাড়ীর দিকে আবার যাবেন।
—তুই হলে ওদের কি জবাব দেব মা রুক্মিণী? বাবা শুধুলেন!
—কাদের বাবা? অম্বুজবাবুদের? হ্যাঁ,—ওখানে আমার বিয়ে দিও না তুমি।

—ছেলেটিকে দেখলাম—বেশ সুন্দর।

—শিমুলফুল দেখতে সুন্দর হয় বাবা!

—শিমুলফুল কি গোলাপ ফুল, তুই কেমন করে চিনলি রুক্মিণী?—সত্যভামা সক্রোধে শুধুলো!

রুক্মিণী হেসেই জবাব দিল,—গোলাপের গন্ধ দূর থেকেই পাওয়া যায় দিদি—কাছে যাবার দরকার হয় না—কাছে যেতে হলে কাঁটার আঘাতের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যেতে হয়! গোলাপ কি এত সহজে পাওয়া যায়?